ইসলাম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

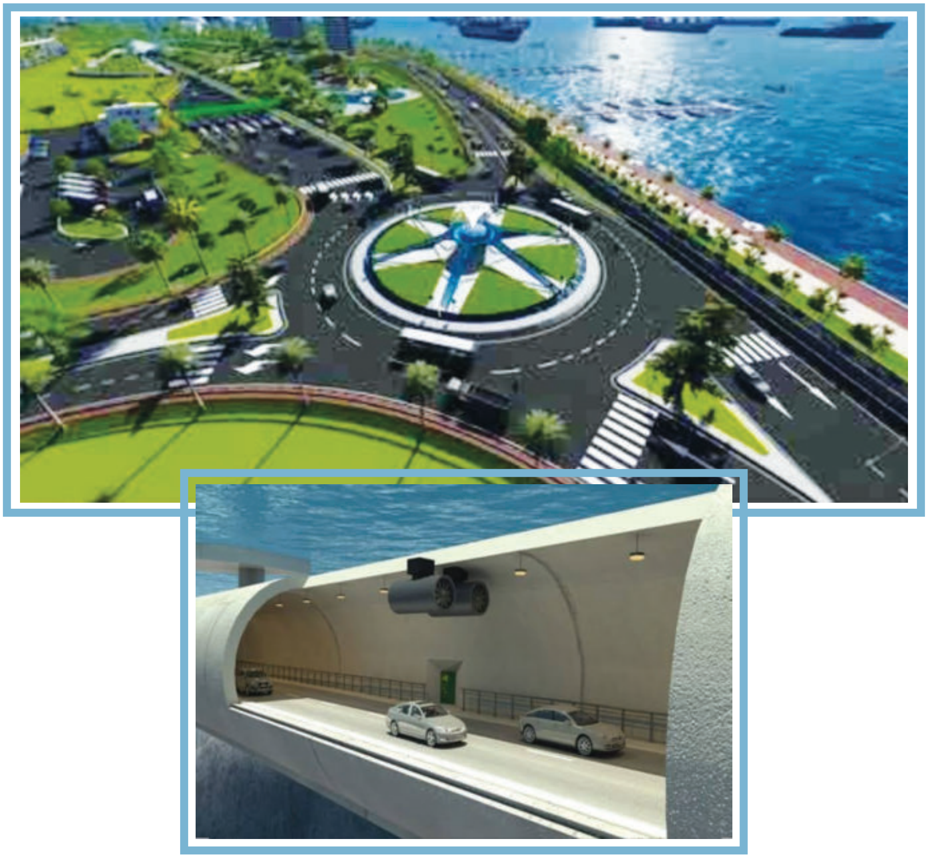

কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্ণফুলী টানেল বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইসলাম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

রচনা

ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমীর হোসেন
ড. মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মদ আবুল কাশেম
মোঃ নাজমুল হাছান
মোঃ মোস্তফা কামাল
নাজমুল হাসান জুন্নুন
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ...., ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
মঞ্জুর আহমদ

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
মোঃ আঃ হান্নান বিশ্বাস
মোঃ সাদ্দাম হোসাইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

ইসলাম শিক্ষার নতুন পাঠ্যপুস্তকটি হাতে পেয়ে আশা করি তুমি আনন্দিত। তোমার জন্য নানা কারণে এ পাঠ্যপুস্তকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের এই পাঠ্যপুস্তকটি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ।

মনে রেখো, একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করতে ইসলাম সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। আর ইসলাম এমন এক পরিপূর্ণ জীবন দর্শন যাতে মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক-এ দু’ জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বিদ্যমান। তোমার বস্তুগত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার চর্চা তোমাকে সার্থক ও পূর্ণ বিকশিত মানুষে পরিণত করবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২- এর আলোকে প্রণীত এ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং এর মধ্যে সন্নিবেশিত বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে তুমি যথার্থ ইসলামি জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ রূপে গড়ে উঠবে। পাশাপাশি এ পাঠ্যপুস্তকের বৈচিত্র্যময় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ও স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে তুমি জীবনমুখী নানা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। আশাকরি এ পাঠ্যপুস্তকটির জ্ঞান বাস্তব জীবনে চর্চা করে তুমি নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে আলোকিত জীবন গঠন করতে পারবে।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
আকাইদ	১
আল্লাহর পরিচয়	২
তাওহিদের মর্মবাণী	৬
আখিরাতের প্রতি ইমান	১০
কুফর	১৭
নিফাক	১৯

অধ্যায় ২: বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
ইবাদাত	২৬
সালাত	২৬
সাওম	৩৪
যাকাত	৪১
হজ	৫০
ওমরাহ	৫৮

অধ্যায় ৩: বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৬৬
ওহি	৬৭
আল কুরআনের মু'জিযা	৭০
তাজবিদ	৭৫
সূরা আল-ফীল	৮০
সূরা আল-কদর	৮৩
সূরা আদ-দুহা	৮৬
সূরা আলাক	৯০
সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত	৯৪
আল-হাদিস	৯৭
মহানবি (সা.) এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদিস	১০০
মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস	১০৮

অধ্যায় ৪: বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
আখলাক	১০৯
আখলাকে হামিদাহ	১১১
আখলাকে যামিমাহ	১২৯

অধ্যায় ৫: বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
আদর্শ জীবন চরিত	১৩৯
মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	১৪০
হযরত মুসা (আ.)	১৪৭
হযরত আলি (রা.)	১৫১
ইমাম হাসান (রা.)	১৫৪
হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.)	১৫৭
সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে মুসলিম মনীষীগণের অবদান	১৬১

অধ্যায় ৬: বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
ইসলামে সহমর্মিতা	১৬৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তুমি একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ করেছ যে, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রতি শ্রেণিতে তোমাদের ইসলাম শিক্ষা বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি আকাইদ সংক্রান্ত। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আকাইদ মানে বিশ্বাসমালা। ইমান ও ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় আছে, সেগুলোতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এসব বিশ্বাসকে বলা হয় আকাইদ। আকাইদের বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো আল্লাহর ওপর ইমান। এ মুহূর্তে তোমাকে একটু 'ইমান মুজমাল'- এর প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তোমার কি মনে আছে ইমান মুজমাল নামক ইমানের অঙ্গীকার বাণীটিতে তুমি কী ঘোষণা দিয়েছিলে? হ্যাঁ, আরবি বাক্যে তুমি যা ঘোষণা দিয়েছিলে, তার প্রথম কথাটিই ছিল: 'আমি ইমান আনলাম আল্লাহর ওপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সকল নাম ও গুণসহ।' এ কথাটি থেকে কিন্তু এ বিষয়টি আমাদের কাছে একেবারেই সুস্পষ্ট যে, সবার আগে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইমান আনতে হবে। আল-কুরআনে তাঁর অনেকগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামসমূহের তাৎপর্য জেনে সেসবের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তোমাদের মনে আছে, সপ্তম শ্রেণিতে আল্লাহর পরিচয় শিরোনামে তোমরা আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত পরিচয় জেনেছিলে। এ ছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রতি শ্রেণিতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুণবাচক নামের পরিচয় জেনেছ। এরই ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতেও আমরা আল্লাহ তা'আলার আরো কয়েকটি গুণবাচক নাম তথা 'আল-আসমাউল হুসনা' সম্পর্কে জানব এবং তদানুসারে বিশ্বাস ও কাজ করব।

দলগত কাজ

তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক পর্যবেক্ষণ বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে আকাইদ সংক্রান্ত যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, তা খাতায় বা পোস্টারে উপস্থাপন করো।

আল্লাহর পরিচয়

জোড়ায় কাজ

'পরিবেশিত হামদ থেকে মহান আল্লাহর পরিচয় তথা আসমাউল হুসনা সম্পর্কে কী গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার বন্ধুর সাথে আলোচনা করে চিহ্নিত করো'

১. ....

২. ....

৩. ....

মহান আল্লাহর অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে। এ সকল গুণবাচক নামের মধ্যেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। আসো আমরা মহান আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নামের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় জানি।

আল্লাহু রাউফুন (اَللّٰهُ رَءُوْفٌ)

রাউফুন অর্থ পরম-স্নেহশীল, সদয়, অতীব দয়ালু, সমবেদনা প্রকাশকারী ইত্যাদি। আল্লাহু রাউফুন অর্থ আল্লাহ অতি দয়ালু, অত্যন্ত স্নেহশীল। এটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আল্লাহর এ নামটি আর-রাহমান ও আর-রাহীম নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও মায়া রয়েছে। তিনি বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩)

মহানবি (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতাকে একশত ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন, আর এক ভাগ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন।' (বুখারি)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি কতটা দয়ালু, কতটা স্নেহশীল। তবে মহান আল্লাহ কেবল মানুষের ওপরই নন, তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতিই অতীব স্নেহপরায়ণ। হাদিসের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর একান্ত পরিজন। মানুষের পারিবারিক জীবনে পরিবার প্রধান যেমন তার পরিবারের সদস্যদের আদর, স্নেহ, দয়া-মায়া-মমতার বন্ধনে বেঁধে রাখেন, তেমনি জগৎসমূহের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাঁর জগৎসমূহের সকল সৃষ্টিকে পরম মমতা ও স্নেহে লালন-পালন করেন এবং রক্ষা করেন। আসলে মানুষ এবং সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর স্নেহ-মমতা অতুলনীয়।

আমাদের জীবনের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে এমন কোনো ক্ষেত্র ও মুহূর্ত নেই, যেখানে আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর মায়া-মমতা ও দয়ার পরশ নেই। তিনিই দয়া করে অতি যত্নে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের মাতাপিতার অন্তরে দয়া-মায়া সৃষ্টি করে আমাদের পরম আদর-যত্নে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি যেমন এ প্রকৃতি ও পরিবেশকে আমাদের বসবাসের অনুকূল করে তৈরি করেছেন, তেমনি এখানে সুখে-শান্তিতে বসবাসের জন্য আবার নানা জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের জন্য সামাজিক পরিবেশেরও ব্যবস্থা করেছেন। ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মনে আমাদের প্রতি স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে আমাদের জন্য এক সুন্দর মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছেন। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে মহান আল্লাহ যে আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু, তার অজস্র উদাহরণ খুঁজে পাই।

মহান আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁর দেওয়া এসব নিয়ামতের কোনো প্রতিদান চান না। আমরা যদি তাঁর ইবাদাত করি, তাহলে তিনি খুশি হন। আবার যদি তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশ করি, কৃতজ্ঞ হই, তাহলে তিনি তাঁর নিয়ামতকে আমাদের ওপর আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আমাদের একটি ভালো কাজের সাওয়াব তিনি কমপক্ষে দশ গুণ বাড়িয়ে দেন কিন্তু কোনো পাপ করলে কেবল সেই পাপের পরিমাণ শাস্তিই তিনি আমাদের দেন। আর চাইলে সেটাও তিনি মাফ করে দিতে পারেন। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, মহান আল্লাহ অসীম স্নেহশীল।

মহান আল্লাহর স্নেহ ও দয়ায় আমাদের জন্য কল্যাণের পথ সহজ হয়ে যায়। স্নেহ ও দয়ার মাধ্যমে তিনি আমাদের তাঁর অপছন্দনীয় পথ থেকে সতর্ক করেন। তিনি বান্দাকে অপরাধ ও ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে ভয়-ভীতি ও ধমক প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো। (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৬)

আবার স্নেহ ও দয়াপরবশতার কারণেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন, আর আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, ভ্রান্ত ও বাতিল পথ থেকে, যে পথ আমাদের জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। যেমন: মহান আল্লাহ বলেন—

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

অর্থ: আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩০)

মূলত আমাদের ওপর আল্লাহর স্নেহ ও মায়া-মমতার কোনো সীমা নেই। আমরা তাঁর স্নেহ-মমতার সমুদ্রে বসবাস করছি। আমরাও সকলের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র হব, সকলকে ভালবাসব।

আল্লাহু মু'মিনুন (اَللّٰهُ مُؤْمِنٌ)

মু'মিনুন অর্থ নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী। আল্লাহু-মু'মিন অর্থ আল্লাহ নিরাপত্তা দানকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি আপন বান্দাদের মাঝে শান্তি ছড়িয়ে দেন এবং সৃষ্টিজগতের মাঝে নিরাপত্তা বিধান করেন। আর ওহির মাধ্যমে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির যথার্থ তদারককারী। সকল বিষয়ের গোপন রহস্য জানেন। মহান আল্লাহ বলেন–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নিরাপত্তা বিধান করেন। তিনি প্রতিটি জীবের সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তিনি কারো পুণ্য হ্রাস করেন না। কাউকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত শাস্তি দেন না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার অধিকারী। মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির তিনিই অধিক হকদার। বান্দাকে কল্যাণ ও অনুগ্রহ দানের তিনিই অধিক যোগ্য।

আল্লাহ হলেন নিরাপত্তা বিধায়ক ও তত্ত্বাবধায়ক। নিজ বান্দাদেরকে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এসব কিছুই তাঁর জন্য সহজ।

উল্লেখ্য, বান্দার সঙ্গে যখন মু'মিন শব্দ সম্পৃক্ত হয়, তখন তার অর্থ বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দা। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বলে তাকে মু'মিন বলা হয়।

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর গুণে গুণান্বিত হতে উৎসাহিত করেছেন। তাই আমরা তাঁর আল-মু'মিনুন নামের গুণ থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করব। ব্যক্তিগত, পরিবার ও সমাজ জীবনে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার পথ অবলম্বন করে চলব এবং অন্যের বিপদ-আপদ কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করব।

আল্লাহু ওয়াহ্হাবুন (اَللّٰهُ وَهَّابٌ)

'ওয়াহ্হাব' অর্থ অতীব দানশীল, কোনো বিনিময় ছাড়া যিনি সব কিছু দান করে থাকেন। এটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। তিনি পরম দানশীল। তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক রিযিক দান করেন। তিনি তাঁর বান্দার অন্তরে কল্যাণমুখী বিষয় ও প্রজ্ঞা উন্মুক্ত করে দেন। তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও দোয়া কবুলের সৌভাগ্য দান করেন।

মহান আল্লাহ উত্তম অভিভাবক। আমাদের কাছে যে সব নিয়ামত আছে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই অন্তরের প্রশস্ততা দানকারী। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর রহমত ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখেন। সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর দয়া ও দানের মুখাপেক্ষী। এ গুণবাচক নামটি তাঁর ব্যাপক রহমত ও দানের প্রকাশক। তাঁর দয়া দুই ধরনের। প্রথম প্রকারের দয়া সকলের জন্য ব্যাপক। আর অন্যটি তাঁর নির্দিষ্ট বান্দা ও সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۭ

অর্থ: আর আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬)

আল্লাহর বিশেষ রহমত ও নিয়ামত শুধু সৎকর্মশীলদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৬)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্বীয় 'ওয়াহ্হাব' নাম স্মরণ করিয়ে মানব জাতিকে মোনাজাত করতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮)

আমরা মহান আল্লাহর ওয়াহ্হাবুন নামের গুণে গুণান্বিত হবো।

প্রকল্প (একক কাজ)

তোমার বাস্তব জীবনে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ চর্চা বা অনুশীলনের জন্য এক মাস মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে তা সফল বাস্তবায়ন শেষে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন তৈরি করো।

(শ্রেণি শিক্ষকের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী তোমার জন্য সুযোগ ও সামর্থ্যের মধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের যেমন: মাতা-পিতা/দাদা-দাদি/বড় ভাই-বোন/সহপাঠীর সহায়তা নিতে পারো।

প্রকল্পের নাম : বৃক্ষ রোপণ বা বৃক্ষের যত্ন

প্রকল্প শুরুর তারিখ :

প্রকল্প শেষের তারিখ :

সহায়তাকারী : মা-বাবা/ভাই-বোন/সহপাঠী

গৃহীত পদক্ষেপ : টব, মাটি, গাছ সংগ্রহ

....

....

....

অভিভাবকের মতামত/স্বাক্ষর:

তাওহিদের মর্মবাণী

একজন মু'মিনের কাছে সবচেয়ে বড় এবং অমূল্য সম্পদ তার ইমান। তার ইমানের কাছে এ দুনিয়ার সকল সম্পদ, সামগ্রী ও ক্ষমতা একেবারেই তুচ্ছ। আর এ ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলাম নামক চির শান্তির গৃহের প্রবেশদ্বার হলো তাওহিদে বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই মু'মিনের সকল চিন্তা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই তাওহিদে বিশ্বাস হচ্ছে মু'মিন জীবনের মূল চালিকাশক্তি।

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই–এটি হচ্ছে তাওহিদে বিশ্বাসের মূলমন্ত্র। এটি ইসলামের একটি কালিমা বা বাণী। এটিকে বলা হয় কালিমাতুত তাইয়্যেবাহ। আবার এটিকে কালিমাতুত তাওহিদও বলা হয়।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা তাওহিদের বাণীর প্রচার ছিল সকল নবি-রাসুলের প্রধান কাজ। তাঁরা সকলেই মানুষের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং এককভাবে আল্লাহরই ইবাদাত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে আজীবন মানুষের কাছে তাওহিদের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি মানুষকে তাওহিদের পথে আহ্বান জানিয়ে বলতেন, 'হে লোক সকল! তোমরা বলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।' (আহমাদ)

মহানবি (সা.)-কে আহলে কিতাব তথা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের অনুসারীদের নিকট তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার নীতি ও কৌশল সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করব না, তাঁর সঙ্গে কোনো শরিক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা মনে করব না'। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৬৪) মূলত সকল নবি-রাসুলের আহ্বানের কালিমা ছিল একটাই। আর তা হলো: আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়াতে যুগে যুগে নবি-রাসুল প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল মানুষের মাঝে তাওহিদের বাণী প্রচার। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

অর্থ: আল্লাহর 'ইবাদাত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি। (সূরা আন-নাহ্‌ল, আয়াত: ৩৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসুল পাঠাইনি তার কাছে এ ওহি ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদাত করো'। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫)।

তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব

মানব জীবনে তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব অপরিসীম। তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে মানুষের চরিত্রে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাওহিদে বিশ্বাস তাকে সৎকর্মশীল করে তোলে। কারণ, সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে তাকে পরকালে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার জীবনের ভালো-মন্দ সব কাজের হিসাব দিতে হবে। তার কোনো মন্দ কাজ দুনিয়ার কেউ না দেখলেও তা মহান আল্লাহর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই সে পরকালে তার রবের সমীপে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং এ কারণে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে খেয়াল-খুশিমত কোনো কাজ করতে পারে না। আল-কুরআনের ভাষায়: 'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।' (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ৪০-৪১)

তাওহিদের চেতনা মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়ে মানবতার মহিমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। তাই তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের আত্মার প্রকৃত মুক্তি ঘটে। ফলে একজন প্রকৃত তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি সকল নীচতা, হীনতা, ভীরুতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভীক, অকুতোভয় ও সাহসী মানুষে পরিণত হয়। সে যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করে না, তেমনি সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনাও করে না। সে আনুগত্য ও দাসত্ব করে মহামহিম আল্লাহর–যিনি বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র মালিক, সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ। পক্ষান্তরে যারা তাওহিদে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহকে রেখে তারা আল্লাহরই সৃষ্ট অন্যান্য বস্তুর কাছে মাথা নত করে, যা মানুষের আত্মমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। তাই তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত করে।

তাওহিদের বাণী এমন এক অমিয় সুধা, যা পান করে একজন তাওহিদবাদী পরম প্রশান্তি লাভ করে। তখন দুনিয়ার সকল চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-দুর্দশার ঊর্ধ্বে উঠে সে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হযরত ইবরাহিম (আ.) যখন তাওহিদের বাণী প্রচার শুরু করেন, তখন নমরুদের রোষানলে পড়ে তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু তাওহিদের চেতনায় তিনি এমন বলীয়ান ছিলেন যে তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি; বরং এমন বিপদের মুহূর্তেও তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যে এক ও একক সত্তার ওপর ইমান এনেছেন তিনিই তাঁকে রক্ষা করবেন। তিনি ছাড়া কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না। আবার তিনি যদি তাঁকে রক্ষা না করেন তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। এ জন্য হযরত জিরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এসে তাঁর ডানা দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণ না করে এক আল্লাহর ওপর ভরসা করলেন। তাঁর ইচ্ছার ওপর নিজেকে পুরোপুরি সোপর্দ করলেন। ফলে আল্লাহর হুকুমে সে আগুন তাঁর জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গেল। তিনি রক্ষা পেলেন। এটি ছিল তাঁর তাওহিদে দৃঢ় বিশ্বাসেরই ফল।

তাওহিদে প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি এক আল্লাহকে স্বীয় রব (প্রভূ) হিসেবে পেয়ে খুশি হয়। হাবশি ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর জীবনে শুরু হয় তিক্ততা ও বঞ্চনার এক নতুন অধ্যায়। তাঁর মনিব তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রেখে তাঁর বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। তাঁর গলায় রশি বেঁধে মক্কার রাজপথে তাঁকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নেওয়া হতো, পাথরের আঘাতে তাঁর দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে! তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বলা হয়। ইসলাম থেকে ফিরলেই তাঁর মুক্তি। নতুবা তাঁকে আরো ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু তাওহিদের অমিয় সুধা পানকারী হযরত বেলাল (রা.) সকল ব্যথা, যন্ত্রণা সহ্য করে মুখে অনবরত ‘আহাদ, আহাদ’ অর্থাৎ, আল্লাহ এক, আল্লাহ এক উচ্চারণ করতেন। কী আশ্চর্য! এত অত্যাচারের পরেও তিনি আল্লাহর একত্বে অটল। মুমূর্ষু পরিস্থিতিতেও তিনি অত্যাচারীদের জানিয়ে দিলেন: ‘তোমরা যদি আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করেও ফেলো, তবুও আমি ইমানের পথ ত্যাগ করব না’। তাওহিদের কী অপরিসীম শক্তি! একসময় অত্যাচারীদের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয় এবং ইমানের জয় হয়। এভাবে তাওহিদের শক্তির বিপরীতে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারে না।

তাওহিদ মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। জাতিভেদ, বর্ণভেদসহ মানুষে মানুষে সকল ভেদাভেদ দূর করে সকল মানুষকে এক কাতারে শামিল করে। কারণ, তাওহিদ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে সকল মানুষকে মহান আল্লাহ একজন নর ও নারী অর্থাৎ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করে তাঁদের দু'জন থেকেই মানব সম্প্রদায় ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছেন। তাই সকল মানুষ সমান। বিশেষ মর্যাদার মাপকাঠি গোত্র বা বংশ নয়; বরং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত তাঁরাই, যাঁরা আল্লাহভীরু। এ বিশ্বাস জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিশ্ব মানব সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

মানব প্রবৃত্তির একটি সাধারণ প্রবণতা হলো সে শক্তি বা ক্ষমতাকে ভয় করে এবং এদের কাছে মাথা নত করে। এ জন্য কোনো কোনো ধর্মের অনুসারীরা প্রকৃতি ও জীবজগতের বিভিন্ন বাহ্যিক শক্তির উপাসনা ও আরাধনা করে থাকে। কিন্তু তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো শক্তি ও ক্ষমতাকে ভয় পান না এবং এসবের নিকট আত্মসমর্পণও করেন না। সে কেবল সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এমন এক অদৃশ্য সত্তার ইবাদাত করে যিনি এক ও একক, যিনি সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তাঁর প্রভুত্ব সর্বত্র বিরাজমান। তিনি মহান আল্লাহ। তিনি সর্বশক্তিমান।

জোড়ায়/দলগত কাজ

তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে (পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ব্যতীত) জোড়ায় বা দলে আলোচনা করে তুমি/তোমরা একটি তালিকা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করো।

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা জোড়ায় বা দলে পর্যালোচনা করে তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে কী কী পরিবর্তন হয় তা ছোট কাগজে/ভিপ কার্ডে লিখবে।)

তাওহিদের চেতনা

তাওহিদের বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একটি চেতনা সঞ্চারী এবং বিপ্লবী ঘোষণা। এটি হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী এক শাশ্বত বাণী। এ বাণীর ধ্বনি এর বিশ্বাসীদের দেয় এক অপরিমেয় শক্তি, সাহস ও মনোবল। আবার অন্যদিকে এ ধ্বনির উচ্চারণ অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে দেয়। এ বাণীর ঘোষণার মাধ্যমে দুনিয়ার সকল কাল্পনিক ও নকল উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়। আবার এ বাণী আল্লাহর জমিনে কেবল আল্লাহর কালিমাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রেরণা দেয়। সে কারণে এ বাণীর প্রচার-প্রসার ও এর মহিমাকে সমুন্নত রাখতে সমকালীন তাওহিদ বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় যুগে যুগে ইমানদারদের অবর্ণনীয় প্রতিকূলতা ও ইমানের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক সময়ে তাওহিদের দাওয়াতে সাড়া দেওয়া যে কত কঠিন ছিল, এর অনেক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান। এমনকি আমাদের প্রিয় নবি (সা.) বাল্যকাল থেকে যিনি আল-আমিন হিসেবে সুবিখ্যাত এবং সর্বজন প্রিয় ছিলেন, তিনিই যখন রিসালাতের

দায়িত্ব পেয়ে তাওহিদের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন, তখন তিনি তাওহিদ বিরোধীদের কাছে চরম অপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। কেবল তাওহিদের বাণী প্রচারের কারণে তাঁর ওপরেও ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে নেমে আসে নানা লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অপবাদ, বয়কট আর অত্যাচার-অবিচারের স্টিম রোলার। আবার সাহাবিদের মধ্যে কেবল হযরত বেলাল (রা.) নন, শিরক ছেড়ে তাওহিদে আসার জন্য ধনি-গরিব বহু সাহাবিকে নানা বর্বর ও বীভৎস নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। হযরত আম্মার (রা.) ও তাঁর পরিবার চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁদেরকে উত্তপ্ত রোদে মরুভূমির ওপর শুইয়ে রাখা হতো। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আম্মার (রা.) এর পিতা ইয়াসার (রা.) ইন্তেকাল করেন। আর তাঁর মা সুমাইয়া (রা.)-কে আবু জাহল বর্বর নির্যাতন করে শহিদ করে দেয়। এভাবে তাঁরা জীবন দিয়েছেন, কিন্তু তাওহিদ থেকে এক বিন্দুও বিচ্যুত হননি।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

'যেসব বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে আমরা তাওহিদ মজবুত করব'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি বাড়ি থেকে পূরণ করে আনবে। এ ক্ষেত্রে, তুমি তোমার পরিবারের সদস্য বা ধর্মীয়জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো।)

বিশ্বাসসমূহ	কাজসমূহ

আখিরাতের প্রতি ইমান

প্রিয় শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সে শ্রেণিতে আখিরাত জীবনের স্তরগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তারপর, সপ্তম শ্রেণিতে ইমানের সাতটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ইমান, ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান এবং কিতাবসমূহের প্রতি ইমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অষ্টম শ্রেণিতে রাসুলগণের প্রতি ইমান এবং আখিরাতের প্রতি ইমান শিরোনামের আওতায় কিয়ামত, পুনরুত্থান এবং হাশর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সে শ্রেণিতে তাকদিরের প্রতি ইমান এবং শাফা'আত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান শ্রেণিতে আখিরাতের প্রতি ইমান শিরোনামের আওতায় আমরা আখিরাত জীবনেরই অংশ জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

প্যানেল আলোচনা

'পরকালে জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহর ইবাদাতের সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের যেসব দিক উন্নয়ন করা অত্যাবশ্যক'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা প্যানেল বা দলে আলোচনা করে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো।)

জান্নাত আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, উদ্যান, নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, সৎকর্মশীলদের চূড়ান্ত আবাসস্থল। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ইমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চিরশান্তির আবাসস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলা হয়। জান্নাতিরা যা কিছু কামনা করবে, সেখানে তার সব কিছুই পাবে। জান্নাত হলো এমন জায়গা, যেখানে বান্দার কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকবে না। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝
نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝

অর্থ: সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। এটি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত: ৩১-৩২)

আল-কুরআনে আটটি জান্নাতের নাম পাওয়া যায়। কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের নামসমূহ:

১. জান্নাতুল ফিরদাউস
২. দারুল মাকাম
৩. দারুল কারার
৪. দারুস সালাম
৫. জান্নাতুল মাওয়া
৬. জান্নাতুন নাঈম
৭. দারুল খুলদ
৮. জান্নাতু আদন

এ আটটি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

জান্নাত এক চিরন্তন শান্তির আবাসস্থল। জান্নাতিরা সেখানে কখনো কোনো দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির সম্মুখীন হবে না। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। মৃত্যু কখনো তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তারুণ্যও কোনোদিন শেষ হবে না। তারা সেখানে চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখ-শান্তিতে থাকবে। সেখানে তারা কোনো অপ্রয়োজনীয়, অশালীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না। তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাও তাদের সঙ্গে থাকবে। ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম'। আখিরাতের এ জীবন কতই না উত্তম!

জান্নাতের সবকিছুই অনিন্দ্য সুন্দর ও পরম আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত। এর ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্র সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত। সেখানে থাকবে অসংখ্য বাগান। খেজুর, আঙ্গুর আর থোকা-থোকা অপূর্ব সব ফলের সমাহার থাকবে। এমন সুস্বাদু ফল, যার স্বাদ কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। সারি সারি পান-পাত্রে রাখা থাকবে অমৃত সুধা।

জান্নাতে মোট চার ধরনের নদী বা নহর প্রবাহিত রয়েছে। এগুলো হলো নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, পবিত্র পানীয়র নহর এবং মধুর নহর। এ সকল নদী বা নহর ছাড়াও আরো তিন ধরনের ঝরনা জান্নাতে চিরকাল প্রবাহিত থাকবে। সেগুলো হলো–

ক. 'কাফুর' নামক ঝরনা, যার পানি সুগন্ধময় ও সুশীতল।

খ. 'সালসাবিল' নামক ঝরনা, যার পানি সুগন্ধময় ও উত্তপ্ত থাকবে।

গ. 'তাসনিম' নামক ঝরনা, যার পানি থাকবে নাতিশীতোষ্ণ।

মহান আল্লাহ বলেন, 'মুত্তাকিদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু পানীয়র নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল।' (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫)

জান্নাতিরা দুই ভাগে বিভক্ত হবে। ডান দিকের লোক এবং অগ্রবর্তী লোক। ডান দিকের লোকেরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো সকল ব্যাপারে অগ্রবর্তী। তারাই হবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফিরদাউস চাইবে। কেননা, এটিই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরে রয়েছে রহমানের আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।' (বুখারি)

মুত্তাকিদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছাবেন, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। আর জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেন, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং

চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাতে প্রবেশ করো।' তারা বলবেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো।' সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম।

জান্নাতিরা স্বর্ণের সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবেন। সেখানে তাঁরা রোদের তাপ ও শীতের ঠান্ডা অনুভব করবেন না। গাছের ছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফলগুলো তাদের আয়ত্তে রাখা হবে। স্বর্ণ ও রূপায় নির্মিত স্বচ্ছ স্ফটিকের পানপাত্রে তাদের জন্য পানীয় পরিবেশন করা হবে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে, 'যানজাবিল' মিশ্রিত পানপাত্র থেকে। এটা জান্নাতে অবস্থিত 'সালসাবিল' নামক একটি ঝরনা। তারা যেদিকেই তাকাবেন দেখতে পাবে নিয়ামতরাজি আর বিশাল রাজ্য। তাঁদের পোশাক হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশমের। তাঁদের অলংকার হবে রূপার কঙ্কণ আর তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'।

মুত্তাকিরা থাকবেন উদ্যান ও ঝরনার মাঝে। তাঁদের রব তাঁদেরকে যা দেবে সানন্দে তাঁরা তা গ্রহণ করতে থাকবেন। সেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুলগাছ, সারি সারি সাজানো কলাগাছ, বিস্তৃত ছায়া, সর্বদা প্রবহমান পানি আর রঙ-বেরঙের নানা প্রজাতির পাখি। আর থাকবে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল; যা কখনো শেষ হবে না এবং কখনো নিষিদ্ধও হবে না। নেক বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন নিয়ামত তৈরি করে রাখা হয়েছে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কোনো মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ○

অর্থ: কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাঁদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরুপ! (সূরা আস-সাজদা, আয়াত: ১৭)

পুণ্যবান লোকেরা থাকবেন অফুরন্ত নিয়ামতের মাঝে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে স্বর্ণের আসনে হেলান দিয়ে বসবেন। তাদের সামনে চক্রাকারে সোনার থালা ও পান পাত্র পরিবেশন করা হবে। সেখানে থাকবে মন ভোলানো ও চোখ জুড়ানো জিনিস। তাঁরা পান করবেন অতি উৎকৃষ্ট পানীয়, যার মিশ্রণ হবে কাফুর। আল্লাহর বান্দারা এমন এক ঝরনা থেকে পান করবেন, যা তাঁরা ইচ্ছেমতো প্রবাহিত করবেন। আর তাঁদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফলমূল, পাখির মাংস এবং যা তাঁরা চাইবেন। তাঁরা চারদিকে সবকিছু দেখতে থাকবেন। তাঁদের চেহারায় থাকবে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা। বলা হবে, 'তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে'।

বাড়ির কাজ

'জান্নাত লাভের জন্য এখন থেকে যেসব কাজ আমি অভ্যাসে পরিণত করব'

(এই শিরোনামের আলোকে তুমি ইসলামি আকিদাহ দৈনন্দিন চর্চার ক্ষেত্রেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

জাহান্নাম আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, শাস্তির স্থান, দুঃখময় স্থান, নিকৃষ্টতম স্থান, দুর্গন্ধময় স্থান ইত্যাদি। জাহান্নাম গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিপদসংকুল, অতি সংকীর্ণ এক নিকৃষ্ট স্থান। সব সময় এতে আগুন প্রজ্বলিত থাকবে। এটি পাপীদের আবাসস্থল।

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত আছে। জাহান্নামের সাতটি স্তরের নাম হচ্ছে- ১. হাবিয়া, ২. জাহিম, ৩. সাকার, ৪. লাযা, ৫. সাঈর, ৬. হুতামাহ ও ৭. জাহান্নাম। পাপের ধরন অনুযায়ী পাপীরা বিভিন্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে। তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। জাহান্নামিদের অবস্থা হবে চূড়ান্ত অপমানজনক আর শোচনীয় পরাজয়ের। পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ও ভয়ংকর চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতাগণ জাহান্নামের রক্ষী হবেন। যাদের চেহারা দর্শনও শাস্তির ওপর অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে। সর্বনিকৃষ্ট জাহান্নাম হাবিয়া।

জাহান্নাম এক গভীর আগুনের গর্ত। পাপীদের সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের ৭০ হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে বাঁধা হবে। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে বিষধর সাপের দংশন আর জ্বলন্ত আগুন। তাদের কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ করা হবে না। তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারা চিৎকার করবে আর মৃত্যুকে আহ্বান করতে থাকবে। তাদের বলা হবে- 'আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না, অনেক মৃত্যুকে ডাকো।' তখন তারা বলবে,

'হায় আফসোস! যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামি হতাম না।'

নিশ্চয়ই জাহান্নাম সমস্ত দিক থেকে কাফিরদের বেষ্টন করে রাখবে। তাদের নিচে থাকবে আগুনের বিছানা আর ওপরে থাকবে আগুনের চাদর। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই অন্য চামড়া দিয়ে তা পাল্টে দেওয়া হবে। সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা থাকবে না। বলা হবে– 'তোমরা শাস্তি আস্বাদন করো। তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করা হবে না।' তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, 'তোমরা তোমাদের রবকে বলো, তিনি যেন আমাদের থেকে এক দিনের আযাব হালকা করে দেন।' রক্ষীরা বলবে: 'তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের রাসুলগণ আসেনি?' তারা বলবে: 'অবশ্যই এসেছিল'; তখন তারা বলবে: 'তবে তোমরাই আহ্বান করো।' আর কাফিরদের আহ্বান কোনো কাজে আসবে না।

জাহান্নামিদের পোশাক হবে আগুনের। তাদের মুখমন্ডল আগুনে দগ্ধ হবে আর চেহারা হবে বীভৎস। মাথার ওপর গরম পানি ঢালা হবে। চামড়া ও উদরে যা আছে তা গলে যাবে। আর তাদের লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে আবার তাতে ঠেলে দেওয়া হবে।

জাহান্নামিদের খাবার হবে যাক্কুম নামক কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। তাদের পেটে প্রচন্ড ক্ষুধার সৃষ্টি হবে। তারা খাবারের জন্য ফরিয়াদ করতে থাকবে। তখন তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেওয়া হবে। যাক্কুম ভক্ষণের ফলে তা গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে। মনে হবে যেন ফুটন্ত পানি। যাক্কুম গাছ আরবের তিহামা অঞ্চলে জন্মে। এর স্বাদ তিক্ত, গন্ধ অসহ্য। এ গাছ থেকে দুধের মতো সাদা কষ বের হয়, যা গায়ে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ফোসকা পড়ে ঘা সৃষ্টি হয় এবং ফুলে ওঠে। পৃথিবীর যাক্কুম গাছের তুলনায় আখিরাতের যাক্কুম গাছ অতি নিকৃষ্ট ও বিষাক্ত। নবি কারীম (সা.) বলেন; 'যদি যাক্কুমের এক ফোঁটা কষ পৃথিবীতে পড়ে, তবে তা সারা বিশ্বের প্রাণিকুলের খাদ্যবস্তুকে বিকৃত করে ফেলবে। সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, যার খাদ্যই হবে যাক্কুম'? (তিরমিযি)

জাহান্নামে পান করার জন্য আছে টগবগে ফুটন্ত পানি ও গলিত পুঁজ। জাহান্নামিরা প্রচন্ড তৃষ্ণায় ছটফট করে পানির জন্য ফরিয়াদ করতে থাকবে। তাদেরকে এমন পানি দেওয়া হবে, যা তাদের নিকটবর্তী করা হলে তাদের চেহারা জ্বলে যাবে। তারা তৃষ্ণার্ত উটের মতো টগবগে ফুটন্ত পানি পান করবে। আর যখনই তারা তা পান করবে, তখনই তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি গলে মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে।

জাহান্নামিরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, 'আমাদেরকে একটু পানীয় বস্তু দাও, অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে যে রিযিকপ্রাপ্ত হয়েছ, তা হতে সামান্য আমাদের দিকে নিক্ষেপ করো। তখন জান্নাতবাসীরা বলবেন, 'এ দুই জিনিসই মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন।' জান্নাতিরা জাহান্নামিদের জিজ্ঞাসা করবে, 'কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করালো?' তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না। আর মিসকিনদের খাবার খাওয়াতাম না।'

জাহান্নামের জ্বালানি হবে মানুষ, জ্বিন ও পাথর। মহান আল্লাহ বলেন, 'তবে তোমরা সে আগুনকে ভয় করো, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৪) নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকেও বাঁচানোর জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬)

একটু চিন্তা করো সেই জগতের কথা, যখন জাহান্নামিরা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মৃত্যু কামনা করবে। সর্বদিক থেকে তাদের কাছে আসবে মৃত্যু, অথচ তারা মরবে না। তারা জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে ডেকে বলবে, 'হে মালেক! তোমার রব যেন আমাদের শেষ করে দেন।' তাদেরকে বলা হবে, 'নিশ্চয় তোমরা এখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তোমরা ধিকৃত ও নিন্দিত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। কোনো কথা বলো না।' এ কথা শোনার পর নৈরাশ্য আর হতাশা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নেবে। রুদ্ধ হয়ে যাবে তাদের কণ্ঠ, বন্ধ হয়ে যাবে তাদের সকল কথোপকথন। শুধু চিৎকার, আর্তনাদ আর কান্নার শব্দ সর্বত্র ভেসে বেড়াবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে কালো মেষ আকৃতিতে জান্নাত-জাহান্নামের মাঝখানে হাজির করা হবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! তোমরা একে চেনো? তারা উঁকি দিয়ে তাকাবেন এবং বলবেন, হ্যাঁ, এ হলো মৃত্যু। এরপর তাকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতিগণ, তোমরা চিরস্থায়ী, আর মুত্যু নেই। হে জাহান্নামিরা! তোমরা এখানেই চিরকাল থাকবে, আর মৃত্যু নেই।' (বুখারি ও মুসলিম)

এ দুনিয়ার জীবনের পর, আখিরাত জীবন জান্নাত-জাহান্নাম ভিন্ন অন্য কোনো স্থান নেই। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত দিয়ে পথ অতিক্রম করে ওপারে যেতে হবে। তবে সে-ই ভাগ্যবান যে এর থেকে মুক্তি পাবে। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকিগণকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭১-৭২)

দলগত আলোচনা

'আখিরাত দিবসে কল্যাণ লাভের জন্য আমরা যেসব কাজ নিয়মিত চর্চা করবো'

(শ্রেণি শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো)।

আল্লাহ তা'লার সাথে কাউকে শরিক করবো না।...

....

....

....

....

....

কুফর (كُفْرٌ)

ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হচ্ছে তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। এ তাওহিদসহ ইমানের অন্যান্য মূল বিষয়গুলোকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার নাম কুফর।

কুফর (كُفْرٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপন করা, আচ্ছাদন করা, ঢেকে রাখা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা কুফর। এছাড়া যে সকল ইসলামি বিধান কুরআন মাজিদ ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তার কোনো একটিকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করাও কুফরের শামিল। কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে 'কাফির' (كَافِرٌ) বলা হয়।

কুফরের ক্ষেত্র

কুফর ইমানের বিপরীত। আল্লাহর একত্ববাদ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসুল, আখিরাত, তাকদির (ভাগ্য), মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত এসব বিষয়ের কোনো একটিকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা কুফর। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনার পর তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে না চলা ফিসক বা পাপাচার, যা মানুষকে কুফরের দিকে ধাবিত করে। বিশ্বাসের যথার্থতা কাজের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। আবার ইসলামের আদেশ-নিষেধসমূহ অবিশ্বাস করাও কুফর। সালাত, সাওম, হজ, যাকাত এগুলো ইসলামে ফরয ইবাদাত। এগুলো অবশ্যপালনীয়। এগুলোকে অস্বীকার করাও কুফর। এমনিভাবে মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদি হারাম কাজের কোনো একটিকে হালাল মনে করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি আবার হালাল জিনিস ও কাজকে হারাম মনে করাও কুফরের শামিল।

জোড়ায় আলোচনা

আমাদের যেসব কথা ও কাজ কুফরির পর্যায়ে পড়ে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
(পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কুফরের পর্যায়ভুক্ত কথা ও কাজ ব্যতীত আরো যেসব কথা ও কাজ কুফরের পর্যায়ভুক্ত তা জোড়ায় আলোচনা করে শ্রেণি শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো)।

....

....

....

....

কুফরের কুফল ও পরিণতি

কুফরের কুফল অনেক এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রথমত কাফির ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ। কারণ, সে আল্লাহর রাজত্বে বসবাস করে এবং আল্লাহর দেওয়া সকল নিয়ামত ভোগ করে আবার সেই আল্লাহকেই সে অস্বীকার করে। তাই এটি নৈতিক, মানবিক ও বিবেকের পরিপন্থী একটি ঘৃণিত কাজ।

আবার কুফর কেবল অকৃতজ্ঞতাই নয়, এর মাধ্যমে মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়। তাই কাফির আল্লাহ বিদ্রোহী। কেননা, মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তিনিই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক। কিন্তু কাফির আল্লাহর সত্তা, তাঁর মালিকানা এবং তাঁর গুণাবলিকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। এটি ন্যায় ও দয়াবান মালিকের মালিকানায় থেকে অন্যায়ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ।

সর্বোপরি, কুফর জঘন্য পাপের কাজ। পরকালে এর শাস্তি হবে অনেক কঠোর। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে কুফরের ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দিয়ে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর (হাতুড়ি)। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন করো দহন-যন্ত্রণা।' (সূরা আল-হাজ, আয়াত: ১৯-২২) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থ: যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামি, সেখানে (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৯)

কুফর থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা আমাদের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকব এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব।

বাড়ির কাজ

'আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা মেনে চলি, কুফর থেকে নিজেকে দূরে রাখি'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা কুফর থেকে নিজেকে দূরে রাখার কৌশল বর্ণনা করে ২০০ শব্দের একটি প্রতিবেদন তৈরি করো)।

নিফাক

নিফাক আরবি শব্দ। এর অর্থ কপটতা, ভণ্ডামি, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও দ্বিমুখীভাব পোষণ করা। অর্থাৎ অন্তরে একরকম চিন্তাধারা বা বিশ্বাস গোপন রেখে বাইরে তার বিপরীত আচরণ বা ভাব প্রকাশ করা। শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, গোপন করা, চালু করা, অস্পষ্ট করা ইত্যাদি।

ইসলামি পরিভাষায় নিফাক বলতে অন্তরে কুফর ও ইসলাম বিরোধিতা গোপন রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য মুখে ইমানদারসুলভ কথা বলা এবং লোক দেখানো ইসলামি আচার-অনুষ্ঠান পালন করাকে বোঝায়। নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় মুনাফিক। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

অর্থ: আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান এনেছি। কিন্তু তারা মু'মিন নয়। আল্লাহ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন অন্য কাকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে রোগ আছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ, তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮-১০)

নিফাক দুই ধরনের। যথা–

১. বিশ্বাসের নিফাক
২. কর্মের নিফাক।

বিশ্বাসের নিফাক

বিশ্বাসের নিফাক হলো-অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশ করা। কুরআন-হাদিসে এ ধরনের নিফাকের আলোচনা বেশি এসেছে। এরূপ নিফাক কুফরেরই নামান্তর; বরং নিফাক কুফর ও শিরকের চেয়েও নিকৃষ্টতম। এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তি যদিও পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য নিজেকে ইমানদার বলে দাবি করে; কিন্তু তার অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতোই অবিশ্বাস বিদ্যমান।

কর্মের নিফাক

কর্মের নিফাক বলতে বাহ্যিক কাজ-কর্মের মাধ্যমে নিফাকের প্রকাশকে বোঝায়। এটি যেমন প্রকৃত মুনাফিকদের দ্বারা সংঘটিত হয়, তেমনি কখনো কখনো ইমান ও তাকওয়ার ঘাটতি বা দুর্বলতার কারণে মু'মিনদের কাজ-কর্মের মাঝেও প্রকাশ পায়। যেমন: এ ধরনের নিফাক প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এসবের কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে:

১. যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয়, সে তা খিয়ানত করে,
২. যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে,
৩. যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তখন তা ভঙ্গ করে এবং
৪. যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে।'

উল্লেখ্য, ইমানের দুর্বলতাবশত কোনো মু'মিনের কাজের মধ্যে যদি মাঝে মধ্যে উক্ত কর্মের দু' একটি প্রকাশিত হয় তাতে সে প্রকৃত মুনাফিকদের দলভুক্ত হবে না। তবে এটা জঘন্য পাপের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। এটি তার কর্মের নিফাক।

মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও ইমানের কথা মুখে বললেও এবং ইমানদারদের মতো ইবাদাত পালন করলেও অন্তরের দিক দিয়ে তারা ইমানদার নয়। তারা ইসলামবিরোধী। তারা মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ ও অবাধ্য। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

অর্থ: যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ১)

অন্য আয়াতে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত, তিনি তাদেরকে এর শাস্তি দেন আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবেন না।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২-১৪৩)

মুনাফিকরা অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করে মাত্র। তাই তারা দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী। পার্থিব জীবনের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা কাফির ও মুসলমান উভয় দলের সঙ্গেই থাকে। সমাজে তারা নিজেদের ইমানদার বলে জাহির করে। কিন্তু গোপনে তারা ইসলামকে অস্বীকার করে এবং ইমানদারদের সঙ্গে চরম শত্রুতা পোষণ করে। এ জন্য তারা চরম ধোঁকাবাজ। তাদের চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ
قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ○

অর্থ: যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান এনেছি। অথচ, আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও বিশ্বাসীদেরকে প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাদের রোগ বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৮-১০)

মহানবি (সা.) মুনাফিকদের পরিচয় ও চরিত্র প্রসঙ্গে বলেন–

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَ إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ: মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি–যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা খেলাপ করে, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তা খিয়ানত করে। (বুখারি ও মুসলিম)

মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের জঘন্য শত্রু। কারণ, তারা মুখে মুসলমান দাবি করলেও আসলে তারা কাফিরদেরই দোসর। এদের প্রতারণা মুসলমানদের বিপদে ফেলে। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে মুসলমানদের দুর্বলতা ও গোপন কথা কাফিরদের নিকট প্রকাশ করে দেয়। এরা সর্বদা মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় রত থাকে। সমাজে এরা নানা অপকর্মের নেপথ্যে থাকে। এদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ 'সূরা মুনাফিকূন' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুনাফিকরা গোপন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। মহানবি (সা.)কেও মুনাফিকরা বারবার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্যানেল/দলগত আলোচনা

'মুনাফিক আমাদের সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করে'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা প্যানেল বা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

নিফাকের কুফল ও পরিণতি

নিফাক জঘন্যতম পাপ। যেহেতু মুনাফিকরা তাদের অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে, তাই তারা কাফির। এমনকি তারা কাফির অপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ, কাফির, মুশরিকরা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। অন্যদিকে মুনাফিকরা গোপন শত্রু। গোপন শত্রু প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে সব সময়ই বেশি ক্ষতিকর। কারণ, যে প্রকাশ্য শত্রু তার বিরুদ্ধে সচেতন থাকা যায় এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যে গোপনে শত্রুতা করে তার থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর ব্যাপার।

পরকালে মুনাফিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

অর্থ: মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৫)

ইসলামের দৃষ্টিতে নিফাক জঘন্যতম পাপ। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও নিফাকের কুফল অত্যন্ত মারাত্মক। মুনাফেকি স্বভাব মানুষের মনুষ্যত্ব ও চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিক তার স্বার্থ হাসিলের জন্য নানা অন্যায় ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়। আবার অনেক সময় সমাজের মানুষের মাঝে বিবাদ, বিসম্বাদ, অনৈক্য ও অশান্তির জন্যও মুনাফিকের মুনাফেকি দায়ী।

নিফাক থেকে বেঁচে থাকতে আমরা সদা সত্য কথা বলব এবং মিথ্যা পরিহার করে চলব; ওয়াদা পালন করব, আমানত রক্ষা করব, কারো সঙ্গে ঝগড়া করব না এবং অশ্লীল ভাষায় কথা বলব না।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'নিফাক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনে আমি যেসব ভাল কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো'

(উল্লেখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি বাড়িতে করো।)

ক্ষেত্রসমূহ	যেসব ভাল কাজ করবো	যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো
ব্যক্তিগত জীবনে		
পরিবারে		
বিদ্যালয়ে		
সমাজে		

আকাইদের শিক্ষা বাস্তবায়ন: আত্ম-মূল্যায়ন চেকলিস্ট

তুমি তোমার প্রতিফলন ডায়েরিতে নিম্নোক্ত নমুনা অনুসারে এক মাসের একটি আত্ম-মূল্যায়ন চেকলিস্ট তৈরি করবে এবং এ চেকলিস্টের বাম পাশের কলামে বর্ণিত মূল্যবোধগুলো চর্চার প্রযোজ্য তারিখে টিক চিহ্ন দিবে। যে তারিখে কোনও একটি মূল্যবোধ চর্চা করা হবে না বা যে মূল্যবোধ/গুলো নিয়মিত চর্চা প্রযোজ্য হবে না, সে ঘরটি/গুলো খালি থাকবে। প্রযোজ্য তারিখে নিম্নোক্ত নিয়মে টিক চিহ্ন দিবে। চেকলিস্টের তথ্যের আলোকে মাস শেষে শিক্ষার্থী আত্ম- সমালোচনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।

আকাইদের শিক্ষা বাস্তবায়ন: আত্ম-মূল্যায়ন চেকলিস্ট (অগ্রগতি)কার্ড পূরণ

নাম: আইডি: মাসের নাম:

ক্রম	মূল্যবোধ	তারিখ																														
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
১	সত্য কথা বলা	√		√																												
২	ওয়াদা পালন করা		√																													
৩	আমানত রক্ষা করা																															
৪	শালীন ভাষায় কথা বলা																															

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

পৃথিবীর সকল মাখলুককে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে'। (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬) ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়ত সমর্থিত যেকোনো উত্তম কাজই ইবাদাত।

ইবাদাত অর্থ আনুগত্য করা, বিনয় প্রকাশ করা, নমনীয় হওয়া, দাসত্ব করা। ইসলামের পরিভাষায় জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদাত বলে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা ইবাদাতের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছ। ইসলামের প্রধান কয়েকটি ইবাদাত সালাত (নামায), সাওম (রোযা) ও যাকাত সম্পর্কে জানতে পেরেছ। এখানে আমরা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে সালাত (নামায), সাওম (রোযা), যাকাত ও হজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

সালাত

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা পূর্বের শ্রেণির ইবাদাত অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছ। এখন নিশ্চয়ই বাস্তব জীবনে সেগুলো অনুশীলন ও চর্চা করো। নবম শ্রেণির এই অধ্যায় থেকে তুমি চারটি ইবাদাত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ধারণা অর্জন করবে। এভাবে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদাতগুলো নিজে অনুশীলন ও চর্চা করার মাধ্যমে ইবাদাতের মূল শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে।

এই অধ্যায়ের পাঠের আলোচনা শুরুর পূর্বেই একটু মনে করার চেষ্টা করো, পূর্বের শ্রেণির ইবাদাত অধ্যায়ে তুমি কী কী পড়েছিলে বা শিখেছিলে? এই ব্যাপারে তোমার সহপাঠী বন্ধুদের সহায়তা নাও, প্রয়োজনে শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তা নাও। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে তুমি অংশগ্রহণ করবে। তাহলে চলো, আমরা এই ইবাদাত- সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করি।

নামাজ শব্দটি ফারসি ভাষার। আরবিতে সালাত। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত। সালাতই একমাত্র ফরয ইবাদাত যা নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, সুস্থ-অসুস্থ প্রত্যেক মু'মিন বান্দার ওপর প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করা ফরয। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। কোনো কারণে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে, বসে আদায় করতে হবে, বসে আদায় করতে না পারলে শুয়ে সালাত আদায় করতে হবে। তাও সম্ভব না হলে ইশারায় সালাত আদায় করতে হবে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ওযু করতে না পারলে বা পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক বান্দাকে সালাত আদায় করতেই হবে। কোনো কারণে যদি সালাত কাযা হয়েই যায়, তাহলে অবশ্যই কাযা সালাত আদায় করে নিতে হবে। তোমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে সালাত আদায়ের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি শিখেছ ও অনুশীলন করেছ। অষ্টম শ্রেণিতে সালাতুল আওয়াবিন, সালাতুত তাহাজ্জুদসহ বিভিন্ন নফল সালাত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। তারই ধারাবাহিকতায় নবম শ্রেণিতে ইশরাকের সালাত, ইসতিসকার সালাত, ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি ও সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে শিখবে। তাহলে চলো এবার আলোচনা শুরু করা যাক।

জোড়ায় আলোচনা

'পূর্ববর্তী শ্রেণির (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) সালাতের পুনরালোচনা'

শ্রেণি শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক পূর্বের শ্রেণির ইবাদাত অধ্যায়ে সালাত বিষয়ক যা যা তোমরা জেনেছো জোড়ায় আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

সালাতের ইমাম

ইমাম শব্দটি একবচন, বহুবচনে আইম্মাহ। ইমাম শব্দের অর্থ নেতা, সর্দার, প্রধান, অগ্রণী, দিক-নির্দেশক, দলপতি ইত্যাদি। পরিভাষায় জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে, তাকে ইমাম বলা হয়। ইমাম সালাত পরিচালনা করেন। মোটকথা, জামা'আতে নামায পড়ার সময় যিনি নামায পড়াবেন, তাঁকে ইমাম বলে। আর যারা পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন তথা ইকতিদা করবেন তাদেরকে মুকতাদি বলে।

ইমামের যোগ্যতা

একজন ইমামের জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য।

১. মুসলমান হওয়া;
২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া;
৩. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া;
৪. পুরুষ হওয়া;
৫. বিশুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতে সক্ষম হওয়া ও নামাযের বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা।

ইমামতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি

উপস্থিত মুসল্লিগণের মধ্যে যখন নির্ধারিত ইমাম অথবা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের কেউ উপস্থিত না থাকেন, তখন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পর্যায়ক্রমে ইমামতের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

১. যিনি নামাযের মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে বেশি জানেন, তিনিই ইমাম নির্বাচিত হবেন।
২. এ গুণে সবাই সমান হলে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি ইমাম হবেন।
৩. এক্ষেত্রেও সবাই সমান হলে যিনি সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু তিনি ইমাম হবেন।
৪. এতেও যদি সমান হয়, তাহলে যিনি বয়সে বড় তিনিই ইমাম হবেন।
৫. এতেও যদি সকলে সমান হন, তাহলে উপস্থিত মুসল্লিগণের মতামতের ভিত্তিতে ইমাম নির্বাচিত হবেন।

ইমামের দায়িত্ব পালনের নিয়ম

ইমাম নামায শুরু করার সময় মুসল্লিগণ কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন। মুসল্লিগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইমামকে অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ ইমাম তাকবিরে তাহরিমা বাঁধার পর মুক্তাদিগণ তাকবিরে তাহরিমা বাঁধবেন। ইমাম রুকুতে যাওয়ার পর মুক্তাদিগণ রুকুতে যাবেন। কোনো ক্ষেত্রে মুক্তাদি ইমামের আগে রুকু, সিজদা বা কোনো রুকন আদায় করলে মুক্তাদির নামায ভেঙে যাবে। ইমামের পেছনে নামায আদায়ের সময় মুক্তাদি সূরা কিরাআত পড়বেন না। ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করলে বা অন্য কোনো ভুল করলে, নিকটবর্তী মুক্তাদি সংশোধন করে দেবেন। কোনো কারণে ইমামের নামায ভেঙে গেলে মুক্তাদির নামাযও ভেঙে যাবে। তাই ইমামকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে নামায আদায় করতে হয়। যদি ইমামের ওযুভঙ্গ হয়, তবে অন্য কাউকে ইমাম বানিয়ে পেছনে চলে আসতে হবে। নামাযে ইমাম বা মুক্তাদি যে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে, বেহুঁশ হয়ে গেলে অথবা অট্টহাসি দিলে নতুনভাবে ওযু করে পুনরায় নামায শুরু করতে হবে।

ইমামের দায়িত্ব

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য দোয়া করেছেন। প্রিয় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ইমাম হলেন জিম্মাদার আর মুয়াজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! আপনি ইমামদের সুপথে পরিচালিত করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন'। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

ইমামতি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। ইমামকে মানবতার পথপ্রদর্শক ও সরল পথের দিশারি হতে হবে। একজন প্রকৃত ইমামই পারেন, দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সরল পথে পরিচালিত করতে এবং আল্লাহর সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিতে। ইমাম শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়ে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ভাবলে তা কখনো কাম্য নয়। মানুষ, মনুষ্যত্ব ও সমাজ নিয়েও একজন ইমামকে ভাবতে হবে। তাঁকে মানুষের সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

যদি মুসল্লিদের নামাযে ভুল-ত্রুটি হয়, তাহলে কিছু সময় বের করে তাদেরকে সঠিকভাবে নামায আদায় করা শেখাতে হবে। যাঁরা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত শিখেনি, তাদের কুরআন মাজিদ শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআন মাজিদের অন্তত যতটুকু অংশ সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে জানলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়, এতটুকু তিলাওয়াত শেখা ফরয। মুসল্লিদের ফরয পরিমাণ কিরাআত শুদ্ধ না থাকলে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। নামাযের প্রতি অলস ও উদাসীনকে সচেতন করতে হবে, নামাযের গুরুত্ব বুঝাতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। সমাজের কেউ শরিয়তবিরোধী কাজ করলে ধীরে ধীরে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করাও একজন ইমামের দায়িত্ব।

প্রতিবেদন লিখন (একক কাজ)

'একজন ইমামকে যেসব কারণে আমি সম্মান করবো'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি ২০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। এক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, সহপাঠীদের সাহায্য নিতে পারো।

....

....

....

....

....

....

....

সালাতুল ইশরাক (صَلٰوةُ الْإِشْرَاقِ)

ইশরাক অর্থ উদয়, প্রভাত বা সকাল। ইশরাকের নামায হলো প্রভাতের বা সকালের নামায। সূর্যোদয়ের পর যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে ইশরাকের নামায বলে। হাদিসে এ সালাতকে সালাতুদ দোহাও বলা হয়েছে। সালাতুল ইশরাক বা ইশরাকের নামায আদায় করা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা অর্থাৎ আদায় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, আদায় না করলে কোনো গুনাহ হয় না।

সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এ সালাত আদায় করা যায়। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই ইশরাকের নামায পড়ে নেওয়া উত্তম। ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসে দু'আ, দুরুদ, তাসবিহ পাঠ করে এরপর সূর্য পরিপূর্ণ উদয় হলে ২ রাকা'আত করে ৪, ৬ বা ৮ রাকা'আত নামায আদায় করতে হয়। ইশরাকের নামাযের আগে দুনিয়ার কোনো কাজকর্ম না করা উত্তম। কোনো কাজকর্ম করলেও সালাত আদায় করা যাবে, তবে তাতে সাওয়াব কম হবে। যেহেতু সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া হারাম, তাই সূর্যোদয়ের সময় থেকে অন্তত ১৫-২০ মিনিট সময় দেরি করে ইশরাকের নামায আদায় করতে হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের জন্য দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ, তাতে গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইশরাকের নামায অনেক ফযিলতপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ফযিলত সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকে এবং আল্লাহর যিকর করে, তারপর দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, সে একটি হজ ও একটি ওমরাহ এর সাওয়াবের সমান সাওয়াব পাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ (সাওয়াব) কথাটি তিনবার বলেছেন'। (তিরমিযি)

এ নামায আদায়কারীর সগিরা গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.), সাহাবিগণ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ নামায আদায় করতেন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ ও অধিক সাওয়াব অর্জনের জন্য আমরা নিয়মিত ইশরাকের নামায আদায় করব।

সালাতুল ইসতিসকা (صَلٰوةُ الْإِسْتِسْقَاءِ)

ইসতিসকা অর্থ পানি বা বৃষ্টি প্রার্থনা করা। অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে ইসতিসকার নামায বলে। এ নামায সুন্নাত। প্রিয় নবি (সা.) বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ
رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও পশুপালকে পানি দান করো। তাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ করো। মৃত জমিনকে জীবিত করো। (আবু দাউদ)

ইসতিসকার নামায আদায়ের নিয়ম ও ফযিলত

সব বয়সী মুসলিম পুরুষেরা হেঁটে খোলা মাঠে একত্রিত হবে। গুনাহের কথা চিন্তা করে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) খুবই সাদামাটাভাবে, বিনয়-নম্রতা ও আকুতিসহ বাড়ি থেকে বের হয়ে (ইসতিসকার) নামাযের মাঠে উপস্থিত হতেন।' (আবু দাউদ)

ইসতিসকার নামায দুই রাকা'আত, এ নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করতে হয়। এর জন্য কোনো আজান বা ইকামত দিতে হয় না। একজন মুত্তাকি তথা আল্লাহভীরু ব্যক্তি ইমাম নিযুক্ত হবেন। ইমাম উচ্চঃস্বরে কিরাআত পড়বেন এবং সালাম ফিরিয়ে দুটি খুতবা দেবেন। এরপর সবাই মিলে কিবলামুখী হয়ে হাত প্রসারিত করে দু'আ করবে। এভাবে পরপর তিন দিন নামায পড়তে হয়। এই দিনগুলোতে রোযা রাখা এবং দান সদকা করা মুস্তাহাব। এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হলেও তিন দিন পূর্ণ করা উত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বৃষ্টির জন্য নামায আদায় করা ব্যতীতও দোয়া করেছেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী বেদুইন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল বকরিও মরে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন।' তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের দু'হাত প্রসারিত করলেন ও দোয়া করলেন।' (বুখারি)। তাঁর দোয়ার ফলে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

বৃষ্টির নামাযে বিনয়-নম্রতার সঙ্গে গমন করা সুন্নাত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে বান্দার সব প্রয়োজন পূরণ করেন, এ বিশ্বাস অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তোমাদের জন্য তিনি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।' (সূরা নূহ, আয়াত: ১০-১১)

সালাত অনুশীলন

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তুমি আজকের আলোচনা থেকে সালাত সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছো সে অনুযায়ী বাড়িতে চর্চা বা অনুশীলন করবে।

সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব

ধর্মীয় গুরুত্ব

নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত ও দ্বীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। প্রিয় নবি (সা.) সালাতকে দ্বীনের খুঁটি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে নামাযের বিকল্প নেই। যারা নিয়মিত নামায আদায় করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

অর্থ: মু'মিনরাই সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের সালাতে বিনয়ী-নম্র হয়। (সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত: ১-২)

সালাত আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। ব্যক্তির অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে সালাত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে শৃঙ্খলিত এবং সুসংগঠিত জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا
وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করে, নামায তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবে। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তির একনিষ্ঠ ইবাদাতকে গ্রহণ করেন। একাগ্রতার সঙ্গে সালাত আদায় করলে ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। প্রিয় নবি (সা.) বলেন, 'ফরয নামাযের সময় হলে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে একাগ্রতার সাথে রুকু-সিজদা আদায় করে নামায পড়ল, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ না সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তার সারা জীবন এমনটি চলতে থাকবে'। (মুসলিম)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতে আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক। জামা'আতে সালাত আদায় করলে একাকী আদায়ের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় (অর্থাৎ জামা'আতে সালাত আদায় করে), আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার আয়োজন করেন। যতবার সে সকাল সন্ধ্যায় যায়, ততবারই। (বুখারি ও মুসলিম)

বিচার দিবসে প্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো নামায। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সর্বপ্রথম বান্দার যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো সালাত।' (ইবনে মাজাহ)

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। মহানবি (সা.) বলেন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

অর্থ: বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

প্যানেল/দলে আলোচনা

'নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমার/আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে যেসব পরিবর্তন করব'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা প্যানেল বা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো)।

সামাজিক গুরুত্ব

সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত সমাজে ঐক্য, শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জামা'আতে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একই সারিতে দাঁড়িয়ে ঐক্যের বীজ বপন করে সাম্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো'। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

সালাতের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার একে-অপরের খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ হয়। এর মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বাড়ে। সালাতের অনুশীলন মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। এতে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নামায আদায়ের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া পূর্বশর্ত। ফলস্বরূপ মানুষ পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

ধৈর্যশীলতা সালাতের অন্যতম শিক্ষা। সালাতের সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে মানুষ ধৈর্যধারণে পারদর্শী হয়ে উঠে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ

অর্থ: হে ইমানদারগণ, তোমরা সালাত এবং ধৈর্যের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

সালাতে অভ্যস্ত ব্যক্তি যাবতীয় অশ্লীলতা এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকে। সালাত মানুষকে পুণ্যকাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অর্থ: নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৫)

<table>
<tr><th colspan="16">প্রকল্প কাজ (একক)</th></tr>
<tr><td colspan="16">তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে নফল সালাত চর্চা বা অনুশীলনের জন্য ১৫ দিন মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে তা সফল বাস্তবায়ন শেষে নির্ধারিত ছকে উপস্থাপন করবে।
(শ্রেণি শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক কাজটি শুরু করবে)।</td></tr>
<tr><td colspan="16">প্রকল্পের নাম: নফল সালাত আদায় করি, শুদ্ধ জীবন গড়ি</td></tr>
<tr><td colspan="9">প্রকল্প শুরুর তারিখ:</td><td colspan="7">প্রকল্প শেষের তারিখ:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বিবেচ্যদিক</td><td colspan="15">তারিখ</td></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td><td>০৬</td><td>০৭</td><td>০৮</td><td>০৯</td><td>১০</td><td>১১</td><td>১২</td><td>১৩</td><td>১৪</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>নফল সালাতের নাম</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>আদায়ের সময়</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>সালাতসমূহ আদায়ের মাধ্যমে আমার যে অনুভূতি জাগ্রত হলো।</td><td colspan="15">..
....
....</td></tr>
<tr><td colspan="16">অভিভাবকের মতামত/স্বাক্ষর:</td></tr>
</table>

সাওম

সাওম বা রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সবার ওপর রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দেবেন। পানাহার না করার কারণে রোযাদার ব্যক্তির মুখে যে ঘ্রাণ তৈরি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধ থেকেও অধিক প্রিয়। রমযান মাস, সিয়াম পালন, তারাবিহর সালাত ও লাইলাতুল ক্বদর সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের জন্য বিশেষ উপহার।

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা সাওম পালন সম্পর্কে বেশ কিছু বিধি-বিধান শিখেছ। তারই ধারাবাহিকতায় এবার তোমরা সাওমের প্রস্তুতি, রমযান মাসের ফযিলত, লাইলাতুল ক্বদরের মাহাত্ম্য, ঈদ ও ঈদের দিন সম্পর্কে জানতে পারবে। তোমরা যথাযথভাবে সাওম পালন করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পারবে এবং সে অনুযায়ী মানবিক জীবন গঠন করতে পারবে। তাহলে চলো! এবার আমরা মূল আলোচনা শুরু করি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইবাদাত অধ্যায়ে সাওম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে তুমি/তোমরা বিগত রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করেছ, তোমার বন্ধুর সঙ্গে সেসব ইবাদাতের অভিজ্ঞতা বিনিময় করো। তুমি/তোমরা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বিগত রমযান মাসের স্মৃতিচারণ করে যা যা পেলে, তা নিচের ছকে লিখে ফেলো।

স্মৃতির পাতায় সাওম	
কার্যক্রমসমূহ	আমি যা করেছি
বিগত রমযান মাসে যে ইবাদাত বেশি বেশি করেছি।	কুরআন তিলাওয়াত।
সাওমের যে কার্যক্রমটি বেশি ভালো লাগে।	
বিগত রমযান মাসের স্মরণীয় কোনো মুহূর্ত।	
সাওমের যে শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে চর্চা করি।	

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোযা। সাওম দ্বীন ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন। ইসলামি শরিয়তে সালাতের পর সাওম একমাত্র সর্বজনীন ফরয ইবাদাত। অর্থাৎ রমযান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মু'মিন ব্যক্তির ওপর সাওম পালন করা ফরয। এক মাসের সিয়াম সাধনা মু'মিন ব্যক্তিকে তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে সাহায্য করে। ফলে ইবাদাতের প্রতি ইখলাস তৈরি হয়।

সারাদিন পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকার দরুন রোযাদারের ধৈর্য বৃদ্ধি পায়, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা-সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ইবাদাতেরই সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা রোযা সম্পর্কে বলেছেন, 'রোযা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব।' তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে সাওম পালন সম্পর্কে বিস্তারিত শিখেছ। অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা সাওমের প্রস্তুতি, রমযান মাসের ফযিলত,

লাইলাতুল কদরের মাহাত্ম্য ও ঈদুল ফিতর সম্পর্কে জেনেছ। তারই ধারাবাহিকতায় নবম শ্রেণিতে তোমরা যেসব পরিস্থিতিতে সাওম পালন নিষিদ্ধ, যেসব অবস্থায় রোযা ভাঙা বৈধ, ফিদিয়ার বিধান, ইবাদাত হিসেবে সাওমের গুরুত্ব এবং সাওমের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবে। আশা করি, তোমরা সাওমের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। তাহলে চলো, আমরা আলোচনা শুরু করি।

যেসব পরিস্থিতিতে সাওম পালন নিষিদ্ধ

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি ইবাদাতকে তাঁর বান্দাদের জন্য সহজসাধ্য করেছেন। তিনি সাধ্যাতীত কোনো কিছুকে বান্দার ওপর চাপিয়ে দেননি। পূর্ববর্তী ইমানদারদের মতো প্রত্যেক সুস্থ, সবল, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'আলা এক মাস সিয়াম পালন ফরয করেছেন। এছাড়া রমযান পরবর্তী দিনগুলোতেও সিয়ামের বিশেষ ফযিলত ও গুরুত্ব রয়েছে।

তবে এমন কিছু দিন ও অবস্থা রয়েছে, যাতে রোযা রাখা হারাম। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা এবং তার পরের তিন দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের ১ তারিখ ও যিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখসমূহ বছরে এই পাঁচটি দিনে যেকোনো ধরনের রোযা রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

সাহাবি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

আর নারীদের ক্ষেত্রে হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) এবং নেফাস (সন্তান জন্মদানের পর রক্তস্রাব) অবস্থায় রোযা রাখা নিষেধ। তবে পরবর্তী সময়ে যখন সুস্থ হবে, তখন উক্ত রোযাগুলো কাযা করতে হবে।

যেসব অবস্থায় সাওম ভাঙা বৈধ

কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তার সাওম বা রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে।

সফর অবস্থায় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি তিন মঞ্জিল (৪৮ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার) বা তার অধিক পথ অতিক্রম করে, তার রোযা পালন করা বা না করা উভয়ের অনুমতি রয়েছে। তবে বেশি কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط

অর্থ: আর কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফর অবস্থায় থাকে, তবে তারা অন্য দিনসমূহে রোযার কাযা

করবে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৪)

গর্ভবতী কিংবা স্তন্যদাত্রী নারী নিজের কিংবা সন্তানের জীবননাশের আশঙ্কা করলে রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন (চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামায দুই রাকা'আত পড়বে) আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারীদের রোযা ভঙ্গের অনুমতি দিয়েছেন (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)। অর্থাৎ তাদের জন্য এ সময় রোযা না রেখে পরবর্তী সময়ে তা পূরণ করার অনুমতি রয়েছে।

যে রোযাসমূহ বিশেষ অবস্থায় ভঙের অনুমতি রয়েছে, পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

ফিদিয়ার বিধান

ফিদিয়া অর্থ কাফফারা, মুক্তিপণ ইত্যাদি। এমন অসুস্থ বা বৃদ্ধ ব্যক্তি, যার সুস্থতার আশা করা যায় না অথবা যদি কোনো ব্যক্তি রোযার কাযা আদায় না করে মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে রোযার ফিদিয়া আদায় করতে হবে। রোযার ফিদিয়া হলো এক ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ অর্ধ সা' বা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা আটা অথবা সমপরিমাণ মূল্য প্রতিটি রোযার পরিবর্তে কোনো মিসকিনকে প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ

অর্থ: (আর যদি কারো জন্য রোযা রাখা নিতান্তই কষ্টকর হয়) তাহলে সে (প্রতিটি রোযার পরিবর্তে) ফিদিয়া হিসেবে একজন অভাবীকে খাওয়াবে। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৪)

সাহাবি হযরত আনাস (রা.) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক কিংবা দুই বছর রোযা রাখতে পারেননি। তাই প্রতি রোযার পরিবর্তে তিনি একজন মিসকিনকে গোশত-রুটি খাইয়েছেন। (ফাতহুল বারি) প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে ইফতার ও সাহরি খাওয়ালেও ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান কোনো ব্যক্তি রোযা না রেখে ফিদিয়া আদায় করলে তা জায়েয হবে না।

একক কাজ

'ফিদিয়ার প্রযোজ্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শ্রেণি শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি ফিদিয়ার প্রযোজ্য ক্ষেত্রগুলো উপস্থাপন করো)।

ইবাদাত হিসেবে সাওমের গুরুত্ব

আরবি 'সাওম' শব্দের অর্থ বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, পাপাচার, কামাচার থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোযা। যা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ওপর ফরয। রোযার অনেকগুলো প্রকার রয়েছে, তন্মধ্যে রমযান মাসের রোযা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ওজর (বিশেষ অপারগতা) এবং রোগ ব্যতীত রমযানের একটি রোযা ভাঙল, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর কাযা আদায় হবে না। যদিও সে সারা জীবন রোযা রাখে'। (বুখারি)

একজন মু'মিনের আত্মশুদ্ধির ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো সিয়াম বা রোযা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

অর্থ: হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

অন্যান্য ইবাদাত মানুষকে দেখানো যায় বলে এতে রিয়া বা লৌকিকতার সম্ভাবনা থাকে। আর রোযা এমন একটি বিশেষ ইবাদাত যা রোযাদার নিজে জানতে পারে। চাইলেও কাউকে দেখানো যায় না। তাই আল্লাহ তা'আলা এর বিশেষ প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, 'মহান আল্লাহ বলেন,

اَلصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

অর্থ: রোযা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দিব'। (বুখারি ও মুসলিম)

প্রিয় নবি (সা.) বলেন, 'রোযাদারের জন্য দুইটি খুশি। একটি হলো তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।' (বুখারি ও মুসলিম)

সিয়াম সাধনার ফলে রোযাদার অনাহার, অর্ধাহার ও পিপাসায় থাকা মানুষ কতটা দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করে তা অনুভব করতে পারে। ফলে রোযাদার সমাজের সকলের প্রতি বিশেষভাবে অসহায়, গরিব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

আগুনের তাপ যেভাবে একটি বাঁকা কাঠকে সোজা করে তোলে, তেমনিভাবে রোযা বান্দার কলবের রিপু

দূরীভূত করে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পরনিন্দা, ঝগড়া-ফাসাদ, অশ্লীলতার চর্চা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে। এতে আমাদের দৃষ্টি নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের দিকে নিবদ্ধ হয়। অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। পাশবিকতা ও পশুত্ব অবদমিত হয়। আমাদের চরিত্রে পশুসুলভ গুণের অবদমন ও ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় এবং রুহানি (আত্মিক) শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই অন্তর আত্মার পশুত্ব দমনে রোযার কোনো বিকল্প নেই।

খাবার গ্রহণের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোযাদার আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এ সবকিছু থেকে বিরত থাকেন। ফলে রোযাদার অন্তরাত্মাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হন। মহানবি (সা.) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِيْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ
فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهُ بِالْجُوْعِ

অর্থ: নিশ্চয়ই শয়তান মানব শরীরের রক্তের মতো চলাচল করে, তাই তাদের চলাচলের পথকে ক্ষুধার মাধ্যমে সংকোচন করে দাও। (তাবকাতুশ শাফী'ইয়্যাহ)

আর রমযান মাসে রোযা রাখার মধ্য দিয়ে সারা দিন প্রচণ্ড ক্ষুধা-তৃষ্ণা সত্ত্বেও পানাহার পরিহার করতে হয়। রাতে দীর্ঘ সময় তারাবির নামায আদায় এবং ভোররাতে ঘুম ভেঙে সাহরি গ্রহণ করতে হয়। এর মাধ্যমে রোযাদারের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়। যারা এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে, পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন,

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

অর্থ: রমযান মাস ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

তিনি আরো বলেন- اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ অর্থাৎ রোযা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অর্ধেক। (তিরমিযি)

সাওমের নৈতিক শিক্ষা

সাওম এমন এক ইবাদাত যা সাওম পালনকারীকে দান করে সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মিক তৃপ্তি, নতুন উদ্দ্যম ও প্রেরণা। সাওমের বিশুদ্ধতা যখন বান্দার অন্তর ছাড়িয়ে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পৌঁছে যায়, তখন ঐ ব্যক্তি হয় সর্বোচ্চ নীতিবান। তাঁর হাত দ্বারা কোনো অন্যায় হয় না। সে কাউকে অশালীন ও বিব্রতকর কথা বলে না। সাওমের অন্যতম নৈতিক শিক্ষা মিথ্যা পরিত্যাগ করা। কোনো ব্যক্তি সাওম পালন করা সত্ত্বেও মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে না পারলে তার রোযা রাখা আর না রাখার মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

সাওমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজ হতে বিরত থাকার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। সাওম অবস্থায় আমাদের অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া এবং ঝগড়া-বিবাদ করা উচিত নয়। কেউ যদি রোযাদারকে গালি দেয় বা সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে রোযাদার শুধু বলবে, 'আমি রোযাদার'।

সাওম আমাদের ইমান ও তাকওয়ার নৈতিক শিক্ষা দেয়। একজন মু'মিনের নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া পূর্বের জীবনের গুনাহ মাফ, যা সাওমের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে ও সাওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারি)

হাদিসে রোযাকে ঢালস্বরূপ বলা হয়েছে। তবে মিথ্যা কথা ও গিবত দ্বারা রোযার বরকত নষ্ট হয়। হালাল রিযিক আহার রোযার অন্যতম শর্ত। রোযার মূল উদ্দেশ্য হলো অন্তরের পাশবিকতা নির্মূল করা, যা হারাম খেয়ে কখনো সম্ভব নয়। রোযা মানুষকে কাম ক্রোধসহ সকল রিপুকে দমন করে।

দলগত কাজ

'ইবাদাত হিসেবে সালাত ও সাওমের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে ইবাদাতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।)

তুলনার ক্ষেত্রে	সালাত	সাওম
ফরয		
ওয়াজিব		
সময়/কখন		
শিক্ষা		

সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সাওম মানুষকে ভোগে বিতৃষ্ণ, ত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই শুধু সাওম নয়; বরং সমাজের অবহেলিত অসহায় মানুষদের দুঃখ, দুর্দশা, ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা অনুভব করা এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়াকে বোঝায়। রমযান মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করা সাওমের অন্যতম শিক্ষা। মহানবি (সা.) নিজে বেশি বেশি দান-সদকা করতেন এবং রমযান মাস এলে তার দানশীলতা আরো বেড়ে যেত। সাওমের এই ত্যাগের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হলে সমাজে সহমর্মিতা ও সহানুভূতির বীজ অঙ্কুরিত হয়। সমাজে মানুষে মানুষে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ দূর হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন , 'এ মাস (রমযান মাস) সহানুভূতির মাস। (ইবনে খুজায়মা)

সাওমের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শিক্ষা অশ্লীলতা, গালিগালাজ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছেন।

রমযান মাস আসলে দেখা যায় কিছু মুনাফাখোর মজুতদার ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়, এ কারণে সকল শ্রেণির লোক বিপাকে পড়ে। এটি সরাসরি সাওমের শিক্ষার বিপরীত।

সাওমের সামাজিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সামাজিক অস্থিরতা, ঘুষ-দুর্নীতি, মিথ্যা ও চরিত্রহীনতার কলুষতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আদর্শ ও কল্যাণমুখী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

'সাওম পালনের মাধ্যমে তোমার নিজের বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের জীবন-যাপনে কী কী পরিবর্তন হলো তা পর্যবেক্ষণ করো'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি নিজেকে বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে পবিত্র রমযান মাসে পর্যবেক্ষণ করে তোমার বা তাদের মধ্যে পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করো।

(পবিত্র রমযান মাসে এ কাজটি সম্পন্ন করবে।)

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

প্রিয় শিক্ষার্থী

যাকাত ইসলামের অর্থনৈতিক স্তম্ভ। সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। যাকাত সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সম্পদে অসহায়, গরিব-দুঃখী ও নিঃস্বদের হক। এ হক বা অধিকার আদায় করা অবশ্যকর্তব্য। তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে

যাকাতের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো। যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত, যাকাত ব্যয়ের খাত, যাকাতের গুরুত্ব, যাকাত আদায় না করার পরিণাম, যাকাতের নিসাব এবং যাকাত হিসাবের নিয়ম সম্পর্কে জেনেছ। চলো আমরা আরো বিস্তৃত পরিসরে কৃষিজ ফসল, ব্যবসায়িক সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে নিই।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত অর্থ হলো পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মনের কলুষতা দূর হয়। তার অন্তর থেকে কার্পণ্য চলে যায়। তার অন্তর মানুষের প্রতি সদয় হয়। এভাবে তার মনের পবিত্রতা অর্জিত হয়। এছাড়া তাঁর সম্পদে অসহায়, গরিব-দুঃখীদের যে হক আছে তা যাকাতের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। ফলে তার সম্পদও পবিত্র হয়। এ জন্য যাকাতের অর্থ পবিত্রতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

অর্থ: 'তাদের সম্পদ হতে 'সদকা' গ্রহণ করবেন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৩)।

তাছাড়া যাকাত দানকারীর সম্পদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন। যাকাত প্রদানের ফলে সমাজে অসহায়, গরিব-দুঃখী ও নিঃস্বদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সামগ্রিক উৎপাদন, সরবরাহ ও ভোগ-ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের অর্থনীতি গতিশীল হয় এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। তাই যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এজন্য যাকাতের অন্য অর্থ বৃদ্ধি।

ইসলামি পরিভাষায়, সাহিবে নিসাবের সম্পদে দরিদ্র, অসহায়, গরিব, অভাবী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে, তা যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়ার নামই যাকাত।

প্যানেল আলোচনা

'সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান করলে আমাদের সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন করো)।

উশর (عُشْرٌ) বা ফসলের যাকাত

সোনা, রূপা, নগদ টাকা ও ব্যবসায়িক সম্পদের যেমন যাকাত প্রদান করতে হয়; তেমনি জমিনে উৎপাদিত কৃষি সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হয়। কৃষি সম্পদ বা ফসলের যাকাতকে উশর নামে অভিহিত করা হয়। একে ফল ও ফসলের যাকাতও বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা ফসলের যাকাতের কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَهُوَ الَّذِيٓ أَنشَأَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ
كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

অর্থ: তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন। এগুলো একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও। যখন এগুলো ফলবান হয়, তখন এগুলোর ফল খাও আর ফসল তোলার দিন ফসলের হক দিয়ে দাও। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৪১)

এই আয়াতে ফসলের হক বলতে ফসলের যাকাতকে বুঝানো হয়েছে।

উশর (عُشْرٌ) অর্থ এক-দশমাংশ বা ১০ ভাগের ১ ভাগ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নদী, ঝরনা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ যাকাত প্রদান করাকে উশর বলে। তবে কৃত্রিম চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়। এটাকে নিসফে উশর বলে।

এ যাকাত অন্যান্য গবাদি পশু, নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্য ইত্যাদির যাকাত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর হিসাবও আলাদা। এতে এক বছর পূর্ণভাবে অতিবাহিত হওয়ার কোনো শর্ত নেই; বরং শুধু তা উৎপাদিত হলেই যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা, উৎপাদিত ফসলই জমির প্রবৃদ্ধি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ফসলের যাকাতের পরিমাণ উল্লেখ করে বলেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ
وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

অর্থ: বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ছাড়া উর্বরতার জন্য উৎপন্ন ফসলের ওপর উশর (১০ ভাগের ১ ভাগ) যাকাত ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর নিসফে উশর (২০ ভাগের ১ ভাগ)। (বুখারি)

উৎপাদিত ফসল ও ফলের নিসাব

ধান, গম, যবসহ অন্যান্য সকল ফসল অল্প হোক বা বেশি, ভূমি থেকে উৎপাদিত সকল শস্যের ওপর উশর ওয়াজিব হবে। তা প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক, কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের ওপর উশর আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর নিসফে উশর ওয়াজিব হয়। (বুখারি) এ হাদিসে ফসলের কোনো পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

আর কারো কারো মতে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ৫ ওয়াসাক হলে উশর ওয়াজিব হবে। এক ওয়াসাক হলো ৬০ সা এর সমপরিমাণ। তাদের দলীল হলো-রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

অর্থ: ‘পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়।’ (বুখারি)

‘পাঁচ ওয়াসাক’-এর পরিমাণ

১ ওয়াসাক সমান ৬০ সা। ৫ ওয়াসাক সমান ৬০×৫ = ৩০০ সা।

১ সা সমান ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। অতএব ৩০০ সা সমান ৯৯০ কেজি বা ২৪ মণ ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হলে যাকাত ফরয হবে।

যেসব ফসলের ওপর উশর ধার্য হবে

জমি থেকে উৎপন্ন প্রতিটি ফসলের ওপর উশর ওয়াজিব। যেমন-খাদ্যশস্য, সরিষা, তিল, বাদাম, আখ, খেজুর, আঙ্গুর, অন্যান্য ফল ইত্যাদি। এছাড়া জমিতে উৎপাদিত শাকসবজির ওপরও উশর ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে জমি থেকে উৎপন্ন সকল ফসলের হক (যাকাত) আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জমিতে যা-ই উৎপাদিত হবে, তাতেই এক-দশমাংশ যাকাত ধার্য হবে। এমনকি জমির ফসলের ফুল থেকে উৎপাদিত মধুতেও যাকাত ধার্য হবে। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সা.) মধু থেকেও উশর আদায় করেছেন।

তবে কারো কারো মতে, যে সকল শস্য মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং যা ওজন ও গুদামজাত করা যায়, সে সকল শস্যেই কেবল যাকাত ফরয। যেমন: গম, যব, কিসমিস, খেজুর প্রভৃতি।

গবাদিপশুর যাকাত

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পশুর অনেক ব্যবহার রয়েছে। সকল পশুর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কেবল গৃহপালিত পশুর ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তবে সকল গৃহপালিত পশুর ওপর যাকাত ফরয নয়। উট, গরু, মহিষ, দুম্বা, ভেড়া ও ছাগলের ওপর যাকাত প্রদান করতে হয়। গবাদিপশুর ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত আবশ্যক:

(ক) প্রতিটি জাতের গবাদিপশুর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্নভাবে নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

(খ) গবাদি পশু চারণভূমিতে বিচরণশীল হতে হবে।

(গ) নিসাব পরিমাণ পশু পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকতে হবে।

উটের নিসাব

উট পাঁচটি হলে যাকাত প্রদান করতে হয়। এর কম হলে যাকাত ফরয হয় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন-

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

অর্থ: উট পাঁচটির কম হলে তার যাকাত নেই। (বুখারি)

গরু বা মহিষের নিসাব

গরু বা মহিষের যাকাত একই নিয়মে প্রদেয় হবে। গরু বা মহিষ ৩০টি হলে যাকাত ফরয হবে। এর কম হলে যাকাত ফরয হবে না। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন,

اَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً

অর্থ: আমি যেন প্রতি ৩০টি গরুতে একটি তাবী অথবা তাবী'আহ (এক বছরের গরু) গ্রহণ করি এবং প্রতি ৪০টিতে একটি 'মুসিন্নাহ' (দু'বছরের গরু)। (তিরমিযি)

বকরি, ভেড়া ও দুম্বার নিসাব

বকরি, ভেড়া ও দুম্বা সমগোত্রীয় গবাদি পশু। এ সকল পশুর নিসাব হলো ৪০টি। এর কম হলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বকরি ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত একটি বকরি। এর বেশি হলে ২০০টি পর্যন্ত ০২টি বকরি। দুইশর অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি বকরি। তিনশ'র বেশি হলে প্রতি এক শ' তে একটি করে বকরি। কারো বকরির সংখ্যা ৪০ থেকে একটিও কম হলে যাকাত নেই। (বুখারি)

ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত

পৃথিবীতে সম্পদের বণ্টন ও উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন। ইসলাম ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ওপর যাকাত প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত সোনা-রুপার যাকাতের পরিমাণের মতোই ২.৫% হারে আদায় করতে হয়। চলো, আমরা ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

ব্যবসায়িক সম্পদ ও পণ্য

যেসব সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে ব্যবসায়িক সম্পদ বা পণ্য বলে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সব ধরনের সম্পদই ব্যবসায়িক সম্পদ হতে পারে। যেমন জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, কৃষিপণ্য, চতুষ্পদ প্রাণী, শেয়ার, যন্ত্রপাতি, গোডাউন, গাড়ি ইত্যাদি। এসব সম্পদ একক মালিকানাধীন হতে পারে বা যৌথ মালিকানাভুক্ত হতে পারে। তবে পারিবারিক প্রয়োজনে কোনো সম্পদ বা পণ্য ক্রয়ের পর লাভে বিক্রি করে দিলেও তা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না।

ব্যবসায়িক সম্পদ ও পণ্যের যাকাত প্রদান করা প্রতিটি বালেগ ও বুদ্ধিমান মুসলমানের ওপর আবশ্যক। ব্যবসায়িক পণ্য যাকাত প্রদানের জন্য সারা বছর বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। যাকাত নিরূপণকালে বছর সমাপ্তি দিবসে মালিকানায় যে সম্পদ থাকবে তা-ই সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে। সমাপ্তি দিবসে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির যে স্থিতিপত্র তৈরি করা হয়, এতে সাকুল্য দেনা-পাওনা, যেমন মূলধন সম্পদ, চলতি মূলধন, অর্জিত মুনাফা, নগদ অর্থ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ, দোকানে এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, কাঁচামাল, প্রক্রিয়ায় অবস্থিত মাল, প্রস্তুতকৃত মাল, ঋণ, দেনা ও পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসাব আনতে হবে। এসবের মধ্য থেকে ব্যাংক ঋণ, ক্রেডিটকৃত মাল এবং অন্যান্য ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হবে।

যেসব ব্যবসায়িক সম্পদের ওপর যাকাত নেই

ব্যবসায়ের স্থাবর পণ্য বা ব্যবসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, জমি, কলকারখানা গোলাঘর, শোরুমে ব্যবহৃত শেলফ, চেয়ার, টেবিল, ফার্নিচার ইত্যাদির ওপর যাকাত ধার্য হবে না। এসব সম্পদ ব্যবসায়ে স্থাবর বা মূল সম্পদ, এগুলো যাকাতের সম্পদের মধ্যে ধরা হবে না। তাই এতে যাকাত ফরয হবে না।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত থাকা আবশ্যক। যথা:

১. পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ পণ্যটি নগদ অর্থ, তাৎক্ষণিক ঋণ বা বাকি ঋণের বিনিময়, প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২. সম্পদের ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবসার নিয়ত তথা লাভের নিয়ত থাকতে হবে। যদিও কোনো কোনো অবস্থায় লাভ না-ও হতে পারে।

৩. ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব পূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য ৮৫ গ্রাম বা ৭.৫০ তোলা সোনার মূল্যের সমান হতে হবে।

দলগত আলোচনা

'ফসল, গবাদি পশু ও ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত সঠিক নিয়মে প্রদান করলে আল্লাহ তা'লা সম্পদ বৃদ্ধি করেন'

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো)।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি। যাকাতকে কেন্দ্র করেই সম্পদের সুষম বণ্টন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হয়। যাকাতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সম্পদ যেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, সেটি নিশ্চিত করা, সমাজের অভাব ও বৈষম্য দূর করা।

আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মানুষকে যাকাত প্রদানের জন্য উৎসাহিত করেছেন। এরপর পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন, যাকাত অনাদায়ে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যাকাতকে ধনীদের জন্য অবশ্য প্রদেয় এবং দরিদ্রদের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। আর এ অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

অর্থ: তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) আদায় করে তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করুন। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ○

অর্থ: তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার। (সূরা আয্ যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী মহানবি (সা.) যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা পূর্ণাঙ্গ ও আবশ্যিকভাবে নয়, ঐচ্ছিকভাবে। এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিচ্ছিন্নভাবে যাকাত আদায় করে থাকেন। যা সমন্বয়হীনতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে পর্যাপ্ত ভূমিকা রাখতে পারছে না। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাময়িকভাবে উপকৃত হলেও স্থায়ী কোনো উপকার হচ্ছে না। ফলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হচ্ছে না।

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাকাত গ্রহীতাকে সচ্ছল করে তোলা। তাকে গ্রহীতার পর্যায় থেকে দাতার পর্যায়ে উন্নীত করা। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাত প্রদানের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। নগদ ৫০০/১০০০ টাকা কিংবা শাড়ি, লুঙ্গি দিয়ে যাকাত প্রদান করা হয়. যা দারিদ্র্য বিমোচনে কোনো কাজে আসে না। তাছাড়া যাকাত যে সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি তারও সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত আদায় ও বণ্টন করা প্রয়োজন।

যাকাত আদায় ও তার যথাযথ ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে ব্যবহৃত ও বণ্টিত হয়, যারা প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে রয়েছে গরিব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির ও নওমুসলিম। কিন্তু বাংলাদেশে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয় না। ফলে যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হলে এর মাধ্যমে বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব।

যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি। সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণের বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। এসব উদ্যোগের পাশাপাশি যাকাতভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন এবং সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। দরিদ্র ব্যক্তিকে এমন পরিমাণ যাকাত প্রদান করা উচিত, যাতে তার কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয় এবং সে আর দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থের মুখাপেক্ষী না হয়। ইমাম নববী বলেছেন, ফকির ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসে। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ)-এর মতে, ফকির-মিসকিনকে তার পরিবার-পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণ সম্ভব– এমন পরিমাণ সম্পদ যাকাত দিতে হবে। আর সর্বনিম্ন এক বছর সচ্ছলভাবে চলার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ব্যক্তিই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়।

যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কারণ, সমাজের গরিব, অসহায়, দুস্থ ও বেকার লোকদের হাতে অর্থ বা ক্রয়

ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু যাকাত বণ্টন করে তাদের হাতে অর্থ পৌঁছালে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা পূর্বের চেয়ে বেশি পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হবে। ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো হবে এবং উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাবে। ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনকারীদের লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। যাকাত এভাবেই ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে চাহিদা, উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করে। এই উৎপাদনকারীরাই যাকাত দেন, যা আবার বর্ধিত মুনাফা হয়ে তাদের হাতেই ফিরে আসে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

অর্থ: মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, প্রকৃতপক্ষে তাই-বৃদ্ধি পায়, তারাই (যাকাতদানকারীই) সমৃদ্ধিশালী। (সূরা আর রূম, আয়াত: ৩৯)

যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং নগদ অর্থকে অলসভাবে ধরে রাখার পথে বাঁধা হিসেবে কাজ করে। সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখলে বছর বছর যাকাত দিতেই তা শেষ হয়ে যাবে। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে যাবতীয় সম্পদ এমনভাবে বিনিয়োগ করা হয়, যাতে কমপক্ষে যাকাতের হারের সমান আয় বাড়ানো সম্ভব হয়। অন্যথায় আসল থেকে যাকাত দিতে হয়। ফলে অর্থনীতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয়। বেকার লোকদের কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, চাহিদা বাড়ে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই যাকাত একদিকে ভোগ ও অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ

অর্থ: আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৬)

সমাজ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করা যাকাতের অন্যতম লক্ষ্য। এদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত বিধানের মাধ্যমে আহরণ ও বিতরণ করা যায়। যদি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাকাত আদায় ও তা বণ্টন করা যায়, তাহলে প্রতিবছর বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করা সম্ভব হবে। একটি গ্রামের যাকাতের অর্থ দ্বারা প্রতিবছর অন্তত ৩/৪টি পরিবারকে স্বনির্ভর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা রিকশা, ভ্যান, নৌকা, সেলাই মেশিন, গাভি, ছাগল বা এ জাতীয় কোনো উপার্জনের উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা যায়। এভাবে ১০-১৫ বছর পর্যায়ক্রমিকভাবে করতে পারলে একটা গ্রামের অসচ্ছলতা দূর করা সম্ভব।

তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাকাত প্রদানের জন্য বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে গ্রাম, সমাজ বা উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিতভাবে যাকাত আদায় করে তহবিল গঠন এবং দরিদ্র পরিবারের তালিকা তৈরি করে পর্যায়ক্রমিকভাবে তাদের মধ্যে সেই তহবিল থেকে টাকা দিয়ে তাদের স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে অতি দারিদ্র্য কিংবা ভূমিহীন পরিবারের বিপরীতে বাৎসরিক আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ কম নয়। যদি আমাদের দেশে যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ ১০ লাখ কোটি টাকা হয়, তাহলে এর থেকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করলে ২৫ হাজার কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব।

যাকাত আদায়যোগ্য ২৫ হাজার কোটি টাকা প্রথম বছর ভূমিহীন ১৫ লাখ পরিবারকে দেড় লাখ টাকার বেশি করে কর্মসংস্থানের কাজে বণ্টন করা সম্ভব। আর ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া যাবে ২৫ লাখ পরিবারকে। পরের বছর আরো ২৫ লক্ষ পরিবারকে এর আওতায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এভাবে ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে দুই কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে স্বনির্ভর করা সম্ভব। এ ১০ বছরের যাকাত গ্রহীতা থেকেও নতুন যাকাত দাতা সৃষ্টি হবে। এতে যাকাত দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে যাকাত গ্রহীতার সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা সম্ভব। তাই সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ করে তার সুপরিকল্পিত বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্যানেল আলোচনা

‘আমাদের সমাজে দারিদ্র্য-দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ’

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা প্যানেল বা দলে আলোচনা করে যাকাত সংক্রান্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বাণী উল্লেখপূর্বক শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো।)

হজ (اَلْحَجُّ)

হজ ইসলামি শরিয়তের অন্যতম ফরয ইবাদাত। শাওয়াল, জিলকদ ও যিলহজের প্রথম ১০ দিনকে হজের সময় ধরা হলেও মূলত ৮ থেকে ১২ যিলহজ পর্যন্ত পাঁচ দিনই হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। হজের নির্ধারিত স্থান হলো কাবা শরিফ, সাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা। হজের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে সূরা হজ নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হজের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

অর্থ: মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)

হজে আর্থিক ও শারীরিক শ্রমের সমন্বয় রয়েছে যা অন্য কোনোটিতে নেই। ফরয হজ আদায় না করলে ইহুদি-নাসারার মতো মৃত্যু হবে বলে হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি হজ করার সামর্থ্য রাখে, তবুও হজ করে না, সে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করল কি খ্রিষ্টান হয়ে, তার কোনো পরোয়া আল্লাহর নেই।

অন্যদিকে হজের ফযিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ করল এবং এসময়

অশ্লীল ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকল, সে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে' (বুখারি)। আর 'মাবরুর হজের বিনিময় জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।'(বুখারি) হজ মানুষকে সচ্ছলতা প্রদান করে। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'হজ ও ওমরাহ পর পর করতে থাকো। কারণ, হজ ও ওমরাহ উভয়ই দারিদ্র্য, অভাব এবং গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে দেয়; যেমন আগুনের ভাট্টি লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে দেয়।'

হজ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি ধর্মীয় গ্রন্থ, অনলাইন সোর্স বা সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে হজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। তোমার সংগৃহিত তথ্যগুলো খাতায় লিখে নাও)।

হজের সচিত্র কার্যাবলি

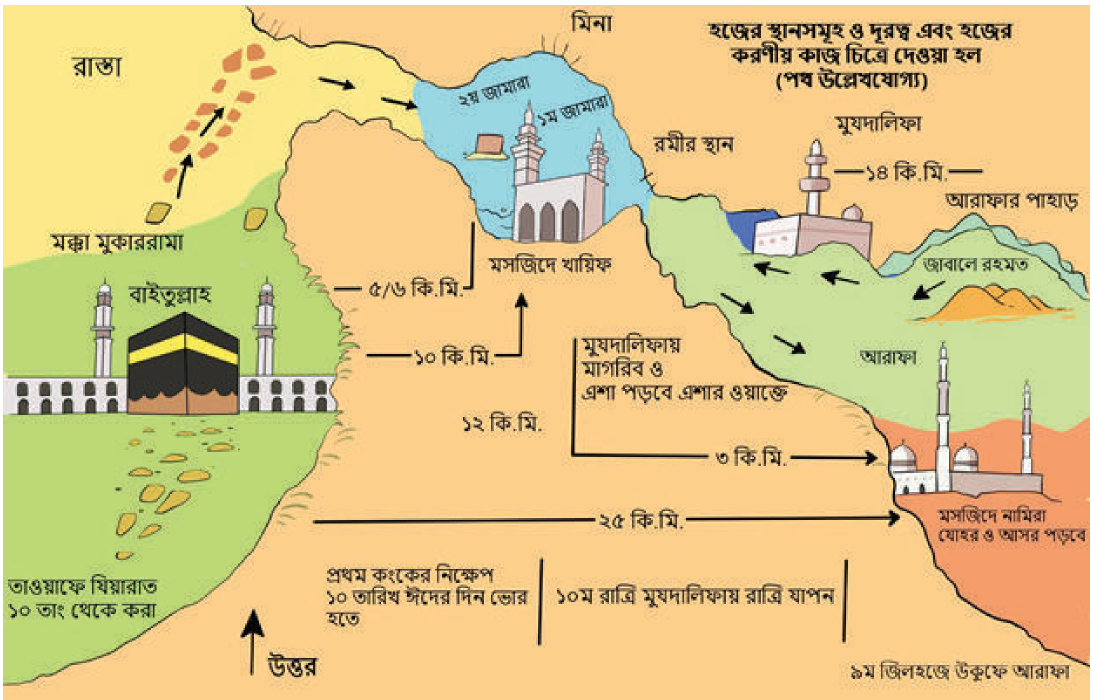

চিত্র : হজের স্থানসমূহ

হজের প্রথম দিন (মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা)

৮ যিলহজ থেকে ১২ যিলহজ পর্যন্ত এই পাঁচ দিনকে হজের দিন বলা হয়। ৮ যিলহজ সকালে হাজিগণ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। ৮ যিলহজের যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ৯ যিলহজের

ফজরের নামায মিনায় আদায় করা এবং রাতে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

হজের দ্বিতীয় দিন (আরাফায় অবস্থান)

হজের দ্বিতীয় দিন ৯ যিলহজ আরাফায় অবস্থান করা ফরয। ফজরের নামায মিনায় পড়ে আরাফার ময়দানের দিকে রওনা করতে হয়। প্রয়োজনে ফজরের আগে রাতেও আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা করা যায়। আরাফার ময়দানে দুপুর ১২টার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়। আরাফার ময়দানে দোয়া কবুল হয়।

মুযদালিফায় অবস্থান

মিনা ও আরাফার মাঝখানে অবস্থিত ময়দানের নাম মুযদালিফা। এখানে ১০ যিলহজ রাত (৯ যিলহজ দিবাগত রাত) অতিবাহিত করা হাজিদের জন্য ওয়াজিব। মুযদালিফায় পৌঁছে এশার ওয়াক্ত হলে এক আজান ও এক ইকামতে প্রথমে মাগরিবের ফরয তারপর এশার ফরয পড়তে হয়। এরপর মাগরিব ও এশার সুন্নাত এবং বিতর পড়তে হয়। মাগরিব ও এশার সালাত আদায়ের পর সুবহে সাদিক পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এখানে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। এ রাতে জাগ্রত থাকা ও ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়া মুস্তাহাব।

হজের তৃতীয় দিন (পাথর নিক্ষেপ, কুরবানি, চুল মুণ্ডন ও তাওয়াফ)

হজের তৃতীয় দিন ১০ যিলহজ মিনায় পৌঁছার পর এ দিনের চারটি কাজ ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হয়:

১. **পাথর নিক্ষেপ করা :** এই দিনের প্রথম কাজ হলো জামারায়ে আকাবায় গিয়ে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব)। এটাকে জামারাতুল কুবরাও বলা হয়।

২. **কুরবানি করা :** এই দিনের দ্বিতীয় কাজ হলো দমে শোকর বা হজের শুকরিয়া স্বরূপ কুরবানি করা (ওয়াজিব)। কিরান ও তামাত্তু হজ পালনকারীদের জন্য এটা ওয়াজিব। আর ইফরাদ হজ পালনকারীদের জন্য মুস্তাহাব।

৩. **চুল মুণ্ডন বা কর্তন করা :** এই দিনের তৃতীয় কাজ হলো হলক বা কসর করা। চুল মুণ্ডন বা কর্তন করা ওয়াজিব। কুরবানি করার পর পুরো মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেলা উত্তম। মুণ্ডনকারীদের জন্য রাসুল (সা.) তিনবার দোয়া করেছেন। তাই এতে ফযিলত বেশি। তবে মহিলারা চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য পরিমানে কেটে ফেলবেন।

৪. **তাওয়াফে যিয়ারত :** এ দিনের চতুর্থ কাজ হলো তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয)। একে 'তাওয়াফে ইফাযা'ও বলা হয়। এটা হজের শেষ রুকন। মিনায় উপরোক্ত কাজগুলো সেরে হাজিগণ মক্কা শরিফে গিয়ে তাওয়াফ-ই-যিয়ারত করেন। তাওয়াফে যিয়ারতের কোনো বদলা নেই, এ তাওয়াফ করতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

হজের চতুর্থ দিন (মিনায় রাতযাপন এবং পাথর নিক্ষেপ)

১১ যিলহজ মিনায় রাতযাপন সুন্নাত। এদিন মিনায় তিন জামারায় পাথর মারা ওয়াজিব। দুপুরের পর প্রথমে জামারায়ে সুগরা, (মসজিদে খাইফের সন্নিকটে) অতঃপর জামারায়ে উসতা, সর্বশেষ জামারায়ে আকাবায় ৭টি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবির বলতে হবে।

হজের পঞ্চম দিন (মিনায় রাতযাপন এবং পাথর নিক্ষেপ)

১২ যিলহজের আগের দিনের মতো মিনায় রাতযাপন সুন্নাত। মিনায় তিন জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।

বিদায়ী তাওয়াফ

পবিত্র মক্কা থেকে বিদায়ের আগে বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। প্রত্যেক হাজি সাহেবের উচিত মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকা'আত নামায পড়ে মূলতাযাম, কাবার দরজা ও হাতিমে দোয়া করা; যমযমের পানি পান করেও দোয়া করা এবং বিদায়ের বেদনা দিয়ে কাবা ঘর থেকে বিদায় নেওয়া। তাওয়াফে বিদা না করলে দম দিতে হবে।

চিত্রাঙ্কন (বাড়ির কাজ)

'হজের কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহ চিত্রাঙ্কন'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি মিনা, মুযদালিফা, আরাফা, বাইতুল্লাহ ইত্যাদি স্থান চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে হজের চিত্র আঁকো।)

হজের প্রকারভেদ

হজ তিনভাবে আদায় করা যায়: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ।

১. তামাত্তু হজ

হজের মাসগুলোতে হজের সফরে বের হওয়ার পর প্রথমে শুধু ওমরাহ এর ইহরাম বাঁধা এবং ওমরাহ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর ৮ যিলহজ তারিখে হজের ইহরাম বেঁধে হজের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করাকে তামাত্তু হজ বলে।

তামাত্তু হজের নিয়ম

হজ পালনকারী হজের মাসগুলোতে প্রথমে শুধু ওমরাহ এর জন্য তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করার মাধ্যমে ওমরাহ পালন সম্পন্ন করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবেন এবং স্বাভাবিক কাপড় পরে নেবেন। ইহরাম অবস্থায় হারাম কাজগুলো তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারপর যিলহজ মাসের ০৮ তারিখ মিনা যাবার আগে নিজ অবস্থানস্থল থেকে হজের ইহরাম বাঁধবেন। তারপর যথাযথ নিয়মে হজের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করবেন।

তামাত্তু হজকারীর জন্য এক সফরে দুটি ইবাদাতের সুযোগ লাভের শুকরিয়াস্বরূপ হাদি বা পশু জবেহ করা ওয়াজিব।

২. কিরান হজ

এক সফর ও এক ইহরামে ওমরাহ ও হজ আদায় করাকে কিরান হজ বলে। অর্থাৎ হজের সফরে ইহরাম বেধে প্রথমে ওমরা আদায় করা এবং ঐ ইহরাম থেকে হজের নির্ধারিত দিনে হজের কার্যাবলি সম্পন্ন করাকে কিরান হজ বলে।

কিরান হজের নিয়ম

মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় একই সঙ্গে হজ ও ওমরার জন্য لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (লাব্বাইকা ওমরাতান ওয়া হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। তারপর মক্কায় পৌঁছে প্রথমে ওমরাহ আদায় করা এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। অতঃপর হজের সময় ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনা-আরাফা-মুযদালিফায় গমন এবং হজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

কিরান হজকারীর জন্য এক সফরে দুটি ইবাদাতের সুযোগ লাভের শুকরিয়াস্বরূপ হাদি বা পশু জবেহ করা ওয়াজিব।

৩. ইফরাদ হজ

হজের মাসগুলোতে শুধু হজের ইহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে ইফরাদ হজ বলে।

ইফরাদ হজের নিয়ম

হজের মাসগুলোতে শুধু হজের ইহরাম বাঁধার জন্য لَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। এরপর মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফে কুদুম অর্থাৎ আগমনী তাওয়াফ এবং হজের জন্য সাঈ করা। অতঃপর ১০ যিলহজ কুরবানির দিন হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। এরপর হজের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করা।

উত্তম হজ

এ তিন প্রকার হজের মধ্যে সাওয়াবের দিক দিয়ে সর্বোত্তম হলো কিরান, এরপর তামাত্তু, এরপর ইফরাদ। তবে আদায় সহজ হওয়ার দিক থেকে প্রথমে তামাত্তু, এরপর ইফরাদ, এরপর কিরান। তামাত্তু হজ পালন করা সবচেয়ে সহজ হওয়ায় অধিকাংশ বাংলাদেশি তামাত্তু হজ আদায় করে থাকেন। আর যাঁরা অন্যের বদলি হজ করতে যান বা যাঁদের অবস্থান মিকাতের মধ্যে, তাঁরা সাধারণত ইফরাদ হজ করেন। এছাড়া কিছুসংখ্যক হাজি কিরান হজ করেন, যাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

ইহরাম দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞাবলি সঠিকভাবে মেনে চলতে না পারার আশঙ্কা থাকলে হজ্জে তামাত্তুই উত্তম।

বদলি হজ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে হজ। এটি মুসলিম উম্মাহর অন্যতম ইবাদাত। একে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে সাওয়াব বেশি এবং উপকারিতাও অনেক। এ ইবাদাতের জন্য রয়েছে বিশেষ দুটি শর্ত। একটি হলো সম্পদশালী হওয়া আর অন্যটি হলো শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া। বিধানগত দিক থেকে হজ আদায় করা সহজ, কিন্তু এর জন্য সফর করতে হয়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জমায়েত। বিশেষ বিশেষ স্থানে একসঙ্গে এই ইবাদাত আদায় করতে হয়। তাই এটি কঠিন ও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে অনেক মানুষের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অক্ষমতার কারণে তা আদায় করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের মাজুরদের প্রতি দয়া করে আল্লাহ তা'আলা বদলি হজ-এর অবকাশ দান করেছেন।

অনেকে মনে করেন, বদলি হজের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম আছে। তা ঠিক নয়। যেভাবে নিজের হজ আদায় করা হয় সেভাবেই বদলি হজ আদায় করা হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, নিয়ত ও তালবিয়ার সময় বদলি হজে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজের নিয়ত করা হয়। এরপর হজের সকল কাজ এক ও অভিন্ন। হজের নিয়ম এক হলেও বদলি হজ সংক্রান্ত কিছু বিষয় এমন আছে, যা বদলি হজে প্রেরণকারী ও প্রেরিত উভয়েরই জানা থাকা জরুরি।

বদলি হজের প্রামাণ্যতা

যদি কোনো ব্যক্তি ফরয হজ আদায় করতে অক্ষম হন তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির হজ পালনকে বদলি হজ বলে। কয়েকটি হাদিস থেকে বদলি হজের বিধান পাওয়া যায়। যেমন:

১. খাসআম গোত্রের জনৈক মহিলা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর যে ফরয আরোপ করেছেন, তা আমার পিতাকে খুব বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তবে কি আমি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ঘটনাটি ছিল বিদায় হজের সময়কার। (বুখারি)

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, শুবরামার পক্ষ থেকে লাব্বাইক। তিনি বললেন, শুবরামা কে? লোকটি বলল, আমার ভাই বা আত্মীয়। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হজ করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, আগে নিজের হজ করো। তারপর শুবরামার হজ। (মুসনাদে আহমাদ)

তিন প্রকার হজের মধ্যে বদলি হজ কোন প্রকার হবে তা যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা হচ্ছে তিনি নির্ধারণ করে দেবেন। যদি ইফরাদ করতে বলেন তাহলে ইফরাদ করতে হবে, যদি কিরান করতে বলেন তাহলে কিরান করতে হবে, আর যদি তামাত্তু করতে বলেন তাহলে তামাত্তু করতে হবে। এর অন্যথা হলে হবে না। বদলি হজ ইফরাদ হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

বদলি হজ যখন করতে হয়

১. হজ ফরয হওয়ার পর আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে;

২. হজ ফরয হওয়ার পর তা আদায়ের আগে বন্দি হলে;

৩. এমন অসুস্থ হলে, যাতে আরোগ্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই;

৪. শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হয়ে গেলে;

৫. দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে বা একেবারেই অন্ধ হয়ে গেলে;

৬. এমন বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেলে যে, বাহনে চলাচলের সক্ষমতাও নেই;

৭. নারী তার হজের সফরে স্বামী বা উপযুক্ত মাহরাম পুরুষ সঙ্গী না পেলে;

৮. কোনো কারণে রাস্তা অনিরাপদ হলে;

৯. সফর করতে গেলে জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।

এসব কারণে ঐ ব্যক্তিকে মাজুর বা অক্ষম গণ্য করা হবে এবং সে নিজের পক্ষ থেকে বদলি হজ করাতে পারবে।

বদলি হজ কে করবেন

যে ব্যক্তির নিজের জন্য হজ আদায় করা ফরয হয়ে গেছে, তার নিজের ফরয হজ আগে আদায় করতে হবে, তারপর অন্যের বদলি হজ আদায় করতে পারবেন। আর যে ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হয়নি তিনি নিজে হজ না করলেও অন্যের বদলি হজ আদায় করতে পারবেন। তাই প্রত্যেক বিবেকবান মুসলিমের উচিত বদলি হজ করানোর আগে ব্যক্তি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা। তারপর ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে বদলি হজ করানো।

যিনি বদলি হজ আদায় করবেন, তাঁকে ইহরামের সময় অবশ্যই যার বদলি হজ আদায় করছেন তার নামেই নিয়ত করতে হবে।

যে ব্যক্তি নিজের ফরয হজ আদায় করেছেন, তার জন্য নফল হজ করার চেয়ে অন্য কারো বদলি হজ করা উত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ করলে, সে-ও মৃতের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।' (মাজমাউয যাওয়াইদ)

হযরত হাসান বসরি (র.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে বদলি হজ করবে, তার জন্যও ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াবের আশা করা যায়।'

জোড়ায়/দলীয় কাজ

'ইবাদাত হিসেবে হজ, কুরবানি এবং আকিকার তুলনামূলক আলোচনা'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা জোড়ায়/দলে আলোচনা করে ইবাদাতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো।)

তুলনার ক্ষেত্রে	হজ	কুরবানি	আকিকা
ফরয			
ওয়াজিব			
সময়/কখন			
শিক্ষা			

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের গুরুত্ব

জুমুআ ও ঈদের সালাত সীমিত পরিসরে মুসলিমদের মাঝে সাম্য ও ঐক্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বিশ্ব মুসলিমের মাঝে সাম্য ও ঐক্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে একমাত্র হজ। ইহরাম বেঁধে 'লাব্বাইক' বলে যখন হারাম শরীফের চতুর্দিক থেকে মানুষ ছুটে আসে এবং বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে থাকে, তখন সাদা-কালো, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকল ভেদাভেদ লোপ পায়। জগৎসমূহের স্রষ্টা, আমাদের একমাত্র প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে তারা সেখানে হাজির হয়। সাম্য প্রতিষ্ঠায় সেখানে সুগন্ধি ব্যবহার করা, টুপি-পাজামা-পাগড়ি পরিধান করা নিষিদ্ধ, এমনকি মাথার চুল পর্যন্ত ছেঁটে ফেলতে হয়। হজ ব্যতীত এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই, যা এত ভিন্ন ভিন্ন দেশের, এত ভিন্ন ভিন্ন বংশের ও বর্ণের মানুষকে একইরূপে চিত্রিত করতে পারে। সাম্যের অপূর্ব চিত্র ফুটে ওঠে যখন সবাই একত্রে চিরশত্রু শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে, সাফা-মারওয়ায় দৌঁড়ায়, আরাফার ময়দানে অবস্থান করে, মিনায় গমন করে এবং আল্লাহর রাহে একত্রে পশু কুরবানি করে। ফলে দুনিয়ায় প্রচলিত ভেদাভেদের কথা মনে স্থান পায় না। এমন অকৃত্রিম সাম্য ও ঐক্য আর কোথাও দেখা যায় না।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজ

মুসলমানদের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ইসলামী মহাসম্মেলন হচ্ছে হজ। এটি আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগরীতে মিলিত হয়। নানাবিধ ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এ সময় সকলে ভাই ভাই হয়ে সম্মিলিতভাবে হজের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে, একে অপরকে সহযোগিতা করে। ফলে মুসলমানদের মাঝে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

অর্থ: এবং মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দিন; তারা আপনার নিকট আসবে (মক্কায়) পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ২৭)

হজ পালনের সময় সবার পোশাক একই ধরনের থাকে। সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক অর্থাৎ হাজির হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির। এক অতুলনীয় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ একত্রিত হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি দেখার ও জানার সুযোগ হয়। তাদের মাঝে আলোচনা করার ও সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি হয়।

যিলহজের নয় তারিখ আরাফার ময়দানে ইমাম সাহেব বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ খুতবা দেন। তাতে আগামী বছরের জন্য মুসলিম উম্মাহর করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের দিকনির্দেশনা থাকে।

হজ থেকে শিক্ষা লাভ করে আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হবো। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার শপথ নেবো।

প্যানেল আলোচনা

‘হজের ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য’

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা প্যানেল আলোচনা করে সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করো।)

ওমরাহ

ওমরাহ আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো ভ্রমণ করা, কোনো স্থানের যিয়ারত করা। হজের নির্দিষ্ট দিনগুলো তথা ৮ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত ছয় দিন ব্যতীত বছরের যেকোনো সময় ইসলামি শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় কা‘বা শরিফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করাকে ওমরাহ বলে।

ওমরাহ এর ফরয দুটি যথা: (১) ইহরাম বাঁধা (২) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা

ওমরাহ্-এর ওয়াজিব দুটি। যথা:

১. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা;

২. মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছাঁটা।

ওমরাহ্ এর সুন্নতসমূহ

১. ইহরামের আগে গোসল করা। গোসল সম্ভব না হলে ওযু করলেও চলবে।

২. একটি চাদর ও একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গিতে ইহরাম বাঁধা।

৩. উঁচু স্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

৪. তাওয়াফের সময় ইজতিবা করা। ইজতিবা হলো ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদর পেঁচিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখা।

৫. সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোঁফ, চুল ও নখ কেটে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ইহরামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। গোসল সম্ভব না হলে ওযু করে নিলেও যথেষ্ট হবে। অতঃপর আতর বা সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করতে হবে। তবে সেন্ট ব্যবহার করা নিষেধ।

এর পর মীকাত থেকে ওমরাহ্-এর নিয়্যতে ইহরাম বাঁধতে হবে। সেলাইবিহীন দুটি কাপড়, চাদর ও লুঙ্গির মতো পরিধান করতে হবে। এই কাপড়ের রং সাদা হওয়া উত্তম। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর দুই রাকা‘আত সালাত আদায় করে ওমরাহ্ এর নিয়্যত করার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করতে হবে। পুরুষগণ জোরে জোরে আর নারীরা আস্তে আস্তে তালবিয়া পড়বেন। এরপর কা‘বা শরিফ সাতবার তাওয়াফ করতে হবে। হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করে আবার হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তাওয়াফ শেষ করতে হবে। এভাবে সাত চক্কর দিতে হবে। সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে হবে। আর সম্ভব না হলে ইশারা করে হাতে চুম্বন করলেও যথেষ্ট হবে। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমে বা এর পিছন বরাবর কিছু দূরে, এখানে সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যেকোনো স্থানে দুই রাকা‘আত তাওয়াফের সালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিন চুমুকে যমযমের পানি পান করতে হবে।

অতঃপর সাতবার সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ বা দৌঁড়াতে হবে। সাফা-মারওয়ার মাঝ পথে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের জোরে দৌঁড়াতে হবে। সাঈর জন্য নির্ধারিত কোনো দোয়া নেই।

সাঈ সমাপ্ত হলে মাথা মুণ্ডন বা মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে নিতে হবে। এভাবেই ওমরাহ্ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং ইহরামের পর যা হারাম ছিল এখন তা হালাল হয়ে যাবে।

ওমরাহ্-এর ফযিলত

সক্ষম হলে সারা জীবনে একবার ওমরাহ্ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলো ঐ সকল কাজ যা মহানবি (সা.) নিজে সর্বদা পালন করতেন এবং অন্যদের তা পালন করতে তাগিদ দিতেন। এটা যখনই করা হোক, তার জন্য প্রতিদান ও বরকত রয়েছে। তবে রমযান মাসে ওমরাহ্ করার ফযিলত বেশি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় রমযান মাসের ওমরাহ্ একটি হজের সমান।’

ওমরাহ পালন করলে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন করো।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৬)

ওমরাহ বান্দার গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়। দরিদ্রতা দূর করে জীবনে সচ্ছলতা আনয়ন করে। মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা হজ ও ওমরাহ আদায় করো। কেননা, হজ ও ওমরাহ দারিদ্র্য বিমোচন করে ও গুনাহ দূর করে দেয় ঠিক সেভাবে, যেভাবে হাঁপরের আগুন লোহা, সোনা ও রুপা থেকে ময়লা দূর করে দেয়।' (তিরমিযি)

তিনি আরো বলেন, 'এক ওমরাহ থেকে পরবর্তী ওমরাহ এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সগিরা গুনাহর জন্য কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করে।' (বুখারি)

ওমরাহ একটি ফযিলতপূর্ণ ইবাদাত। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জীবনে অন্তত একবার ওমরাহ পালন করা উচিত। মহানবি (সা.) জীবনে চার বার ওমরাহ পালন করেছেন। সুতরাং আমরা ওমরাহ পালনের নিয়মকানুন ভালোভাবে জানব এবং যখনই সামর্থ্য হবে তখন তা আদায় করব।

প্রতিবেদন তৈরি

'তোমার বাস্তব জীবনে হজ, কুরবানির শিক্ষার প্রয়োগ বা অনুশীলনের ক্ষেত্রসমূহ'

(বিগত সেশনগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে তুমি উল্লিখিত বিষয়ে অনুশীলন বা চর্চার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

কুরবানি

কুরবানির আরবি শব্দ 'উদহিয়্যাহ'। এর আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ, নিবেদন করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যিলহজ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে শুরু করে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু জবেহ করার নাম কুরবানি। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবিদের উম্মতদেরকেও বিভিন্ন সময় কুরবানি করার আদেশ দিয়েছেন। তবে বর্তমানে প্রচলিত কুরবানি মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.)- এর সময় থেকে শুরু হয়েছে। এ কুরবানির সঙ্গে জড়িত রয়েছে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার খাতিরে ইবরাহিম (আ.)-এর সুমহান ত্যাগের অনন্য ইতিহাস। এটি ছিল মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি ঘটনা। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর এ স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং মহান আল্লাহর ভালোবাসায় ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হওয়ার বার্তা নিয়ে বছর ঘুরে মুসলিম জাতির সামনে আসে ইসলামের এ পর্বটি। এর মাধ্যমে প্রিয় বস্তু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কুরবানি হচ্ছে সকল ব্যাপারে নিজেকে আল্লাহর কাছে নিবেদন ও সোপর্দ করার একটি প্রতীকি ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ○

অর্থ: বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২)

কুরবানির পটভূমি

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে বহুবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। সকল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। একবার তিনি এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে ইঙ্গিতে আদেশ করছেন। তিনি আল্লাহর নবি। নবিগণের স্বপ্নও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তানের ভালোবাসার ওপর আল্লাহর ভালোবাসা তাঁর কাছে অধিক প্রাধান্য পায়। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আল্লাহ যাতে খুশি হন তাকে তা-ই করতে হবে। তিনি আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এ ঘটনাটি কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ

فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيٓ

إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

অর্থ: অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহিম বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০২)

সন্তানের এ তাকওয়াপূর্ণ উত্তর পেয়ে ইবরাহিম (আ.) খুশি হলেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহিম (আ.) পুত্রকে কুরবানির জন্য উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলার এবারের পরীক্ষাতেও ইবরাহিম (আ.) উত্তীর্ণ হলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আ.) কে ডেকে বললেন, 'হে ইবরাহিম! আপনি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলেন! এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।' (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০৪-১০৫)

ইবরাহিম (আ.)-এর তাকওয়া দেখে আল্লাহ তা'আলা খুশি হলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) জান্নাত থেকে একটি দুম্বা এনে ইসমাইলের স্থানে ছুরির নিচে শুইয়ে দিলেন। হযরত ইসমাইল (আ.) এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আ.)-এর ত্যাগের এই অপূর্ব ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কুরবানির রীতি ইবাদাত স্বরূপ ধনবান মুসলিমদের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। তখন থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ইবরাহিম (আ.)-এর সুন্নাত হিসেবে কুরবানি পালিত হয়ে আসছে।

কুরবানির কতিপয় মাসআলা

১. যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ভোর থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তার ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব। সফররত ব্যক্তির ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।

২. যিলহজ মাসের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এ তিন দিনের যেকোনো এক দিন কুরবানির সময়। তবে প্রথম দিন বা যিলহজ মাসের ১০ তারিখে কুরবানি করা উত্তম।

৩. ঈদ-উল-আযহার সালাতের আগে কুরবানি করা জায়েয নয়। সালাতের পর কুরবানি করতে হবে।

৪. সুস্থ গৃহপালিত ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ ও উট দ্বারা কুরবানি করতে হবে। গরু, মহিষ ও উট এক থেকে সাতজন পর্যন্ত অংশীদার মিলে কুরবানি করা যায়। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কেবল একজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করতে হবে।

৫. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে। গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে। উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। তবে ছয় মাসের বেশি বয়সের দুম্বার বাচ্চা যদি এত মোটা হয় যে এক বছরের অনেক দুম্বার মাঝে রেখে দিলে তা চেনা যায় না, তাহলে সে বাচ্চা দ্বারা কুরবানি করা জায়েয। কিন্তু ছাগলের বাচ্চার বয়স এক বছর না হলে কুরবানি জায়েয হবে না।

৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যার একটি অংশ গরিব ও অভাবীকে দেওয়া হয়, এক অংশ আত্মীয়স্বজনদের দেওয়া হয় এবং এক অংশ নিজের জন্য রাখা হয়। এভাবে তিন ভাগ করা মুস্তাহাব।

৭. কুরবানির পশু নিজ হাতে জবাই করা উত্তম।

৮. কুরবানির পশুটিকে কিবলার দিকে মুখ করে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে হয়।

কুরবানির তাৎপর্য

কুরবানি কেবল পশু জবাই করাকে বুঝায় না। কুরবানি হৃদয়-মনের কলুষতা দূর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি পন্থা। হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে কুরবানি। মুসলমানদের কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই প্রমাণ করার জন্য ইসলামে কুরবানির এ রীতি প্রচলন করা হয়েছে। মুসলমানরা পশু কুরবানি দিয়ে এটাই প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে পশু কুরবানি করেছে, প্রয়োজনে এভাবেই আল্লাহর দ্বীনের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করতেও তারা সদা প্রস্তুত।

কুরবানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দার তাকওয়ার পরীক্ষা। তাই যশ ও খ্যাতির প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করতে হবে। কে কত টাকা দিয়ে কুরবানি করছে, কার পশু কত বেশি মোটা-তাজা এ বিষয়গুলো মূল্যহীন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শুধু মানুষের মনের তাকওয়া ও ভালোবাসা লক্ষ করেন। মহান আল্লাহ বলেন—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

অর্থ: কখনই আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না উহাদের গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৭)

কুরবানি একটি উত্তম ইবাদাত। এটি ইসলামের একটি নিদর্শনও বটে। সামর্থ্যবান মুসলমানদের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব। এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুরবানির পশুর শিং, ক্ষুর ও লোমসমূহ নিয়ে হাজির হবে। কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানির দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র করো। (তিরমিযি) তিনি আরো বলেন, 'কুরবানির পশুর যত পশম থাকে, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকি লেখা হয়।' (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

মানবতার চেতনার বিকাশ ঘটাতে কুরবানির শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কুরবানির শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটি সুন্দর, সফল ও কল্যাণ সমাজ গঠন করতে পারি। ত্যাগের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে

আমরা পরোপকারী, সহানুভূতিশীল, আত্মত্যাগী ও আত্মসংযমী হবো। নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে বড় করে না দেখে সমাজের কল্যাণে কাজ করব। এভাবে আমরা সমাজের মানুষ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখতে পারব।

আকিকা

'আকিকা' আরবি শব্দ। এর অর্থ কাটা, ভাঙা, পৃথক করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আকিকা বলতে সন্তান জন্মলাভের পর হালাল পশু জবেহ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা আদায় ও নবজাতক সন্তানের কল্যাণ কামনা করাকে বোঝায়।

আকিকা একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ইবাদাত। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের পূর্বে আকিকা প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে তিনি আকিকার বিধান বহাল রেখেছেন এবং প্রত্যেক নবজাতক শিশুর আকিকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিন নাম রাখা, তার আবর্জনা দূর করা (মাথা মুন্ডন করা) ও আকিকার নির্দেশ দিয়েছেন।' (তিরমিযি)

ইহুদিরা শুধু ছেলে সন্তানের আকিকা করত। মহানবি (সা.) ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য আকিকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তান জন্মের সপ্তম দিন আকিকা করা উত্তম ও সুন্নাত। হাদিসে বর্ণিত আছে 'জন্মের সপ্তম দিনে রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসান ও হুসাইনের আকিকা দিয়েছেন, তাঁদের নাম রেখেছেন এবং তাঁদের মাথা থেকে কষ্ট (চুল) দূর করেছেন' (বায়হাকি)। রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসান (রা.)-এর আকিকা আদায় করার পর হযরত ফাতিমা (রা.)- কে বললেন, 'হে ফাতিমা, এর মাথার চুল ফেলে দাও এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রুপা সাদকা করে দাও। অতঃপর ফাতিমা (রা.) তা পরিমাপ করলেন, এর ওজন হলো এক দিরহাম বা এক দিরহামের কাছাকাছি। (তিরমিযি)

উল্লিখিত হাদিসসমূহ থেকে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা সুন্নাত প্রতীয়মান হয়। যথা:

১. শিশুর জন্য ইসলামি নাম রাখা।

২. মাথা মুন্ডন করা।

৩. আকিকা করা।

৪. মাথার চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রুপা সাদকা করা।

সপ্তম দিনে আকিকা করতে না পারলে, ১৪তম দিন বা ২১তম দিন আকিকা আদায় করা উচিত। তা-ও সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে আকিকা করা যাবে। অভাবের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি তার সন্তানের আকিকা করতে না পারেন, ঐ সন্তান বড় হওয়ার পর সামর্থ্যবান হলে সে তার নিজের আকিকা নিজে আদায় করবে। আমাদের প্রিয় নবি (সা.) নিজের আকিকা নিজেই আদায় করেছেন।

যে পশু দ্বারা কুরবানি আদায় করা যায়, তা দিয়ে আকিকা আদায় করতে হয়। প্রিয় নবি (সা.) ইরশাদ করেন, 'নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দুটি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল দিয়ে আকিকা করবে' (তিরমিযি)। গরু, মহিষ বা উট হলে সাতটি ছাগলের সমান ধরে পুত্রসন্তানের জন্য দুই ভাগ আর কন্যা সন্তানের জন্য এক ভাগ দিতে হয়। একই পশুতে কুরবানির সঙ্গে আকিকা আদায় করা যায়।

আকিকার গোশত নিজে খেতে পারবে, আত্মীয়স্বজন ও গরিব-মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে। কুরবানির গোশতের মতো আকিকার গোশত তিন ভাগে ভাগ করে এক-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়স্বজনের জন্য ও এক-তৃতীয়াংশ গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া সুন্নাত।

প্রত্যেক পিতা-মাতার নিকট সন্তান-সন্ততি অতি প্রিয়। সন্তান লাভ করা দুনিয়ার অন্যতম সেরা নিয়ামত। প্রত্যেক নবজাতক শিশুর জন্ম পরিবারে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তান প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায় করে নবজাতক শিশুর আকিকা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ বান্দাকে পছন্দ করেন এবং তাকে আরো বেশি নিয়ামত দানে ধন্য করেন। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

আকিকার মাধ্যমে নবজাতক শিশু আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয় এবং নবজাতকের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত দূর হয়। আকিকার গোশত বিতরণের মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে নতুন শিশুর শুভাগমনের খুশি উদযাপন করা যায়। নবজাতক শিশুর জন্য সবাই দোয়া করেন। তাই আমাদের উচিত প্রত্যেক নবজাতকের জন্য আকিকা আদায় করা।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইসলামি শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় এই ইবাদাত পালন করতে হবে। ইসলামি শরিয়তের প্রথম উৎস হচ্ছে আল কুরআন। এ গ্রন্থের অপর নাম ফুরকান। হক ও বাতিলের মধ্যে এ ঐশী গ্রন্থ যেহেতু পার্থক্য নির্ণয় করে, সেহেতু একে ফুরকান হিসেবে অভিহিত করা হয়। কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহ প্রদত্ত। কুরআন পড়া ও অনুধাবন করার সময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। কুরআন নির্দেশিত পথে চলা আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির একমাত্র পথ। কুরআন মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানের আঁধার। তাই কুরআন পাঠ এবং অনুধাবন বান্দার একান্ত কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনাচার হচ্ছে সুন্নাহ। যা ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন, যা করেছেন এবং যে পথে চলেছেন তা অনুসরণ করলে কুরআনের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করা হয়। সুন্নাহ বা হাদিস ছাড়া কুরআন অনুধাবন করা ও মেনে চলা অসম্ভব। চলো শরিয়তের উৎস হিসেবে আল কুরআন ও আল হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি ধর্মীয় গ্রন্থ, অনলাইন সোর্স অনুসন্ধান বা পরিবারের সদস্য, ধর্মীয়জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি, সহপাঠী এর সাথে আলোচনা/মতবিনিময়ের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করো। তোমার সংগৃহীত তথ্যগুলো খাতায় লিখে নাও)।

পবিত্র কুরআনের পরিচয়

মহাবিশ্বের বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কুরআন শব্দটি قِرَاءَةٌ (কিরাআতুন) থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, তিলাওয়াত করা ইত্যাদি। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী কুরআন শব্দটি পঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়, তা-ই পঠিত গ্রন্থ। তবে কারো কারো মতে, কুরআন শব্দটি قَرْنٌ (কারনুন) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মিলিত।

পরিভাষায়, কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী, যা মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। এ ছাড়াও আল কুরআন তিলাওয়াতের সুবিধার্থে ৭টি মনজিল ও ৩০টি পারায় বিভক্ত করা হয়েছে। ৫৪০টি রুকু ও ১৪টি সিজদা আছে। কেবল সূরা তাওবা ব্যতীত প্রতিটি সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বাক্যটির উল্লেখ রয়েছে। মোট আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৬,২৩৬ মতান্তরে ৬,৬৬৬টি।

বিশ্বজনীন এ গ্রন্থের আবেদন ও উপযোগিতা সব যুগে এবং সব স্থানেই কার্যকর রয়েছে। কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এ গ্রন্থ দুই পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। প্রথমে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে 'বাইতুল ইজ্জাহ' নামকস্থানে নাযিল হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের ২৩ বছর ব্যাপী ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনা ও কারণ উপলক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। কুরআনের সূরাগুলো মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়নি।

যখন ওহি অবতীর্ণ হতো, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ:)-এর সঙ্গে সঙ্গে তা বারবার পড়তে থাকতেন যাতে করে মুখস্থ হয়ে যায়। সাহাবিদেরকেও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। কুরআন মাজিদ যেহেতু একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি; বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর যুগে একত্রে গ্রন্থাকারে লিখে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য কুরআন মুখস্থ করে রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। আসমানি গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনকে এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে, কলম-কাগজের চেয়েও একে অগণিত সংখ্যক হাফেজে কুরআনের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছেন।

ওহি (اَلْوَحْيُ)

ওহি শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো গোপনে কোনো কিছু জানিয়ে দেওয়া। এ ছাড়াও শব্দটি ইঙ্গিত করা, লেখা এবং গোপন কথা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবি-রাসুলদের ওপর অবতারিত বাণীকে ওহি বলে।

ওহির প্রকারভেদ

ওহি দুই প্রকার। যথা:

১. ওহি মাতলু (আল কুরআন)

২. ওহি গায়রে মাতলু (আল হাদিস)

১. **ওহি মাতলু :** মাতলু অর্থ পঠিত, যা পাঠ করা হয়। যে ওহির ভাব, ভাষা, অর্থ, বিন্যাস সকল কিছুই মহান আল্লাহর এবং মহানবি (সা.) তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তাকে ওহি মাতলু বলে। এটিকে 'ওহি জলি' বা প্রত্যক্ষ ওহি বলা হয়। কুরআন মাজিদ যেহেতু সালাতে তিলাওয়াত করা হয়, তাই আল কুরআনকে ওহি মাতলু বলে।

২. **ওহি গায়রে মাতলু :** গায়রে মাতলু অর্থ অপঠিত। যে ওহির ভাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, কিন্তু রাসুল (সা.) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন তাকে ওহি গায়রে মাতলু বলে। একে ওহি খফি বা প্রচ্ছন্ন ওহিও বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস এ প্রকার ওহির উদাহরণ। এটি সালাতে কিরআত হিসেবে তিলাওয়াত করা হয় না বলে এটিকে অপঠিত ওহি বলা হয়।

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রকার ওহিকে 'কিতাব' বা গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহিকে 'হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

দ্বিতীয় প্রকারের ওহি 'হাদিস' বা 'সুন্নাত' নামে পৃথক ভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

ওহি অবতরণের পদ্ধতি

মহানবি (সা.) এর ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহি নাযিল হতো। প্রসিদ্ধ মতে মহানবি (সা.) এর ওপর সাত পদ্ধতিতে ওহি নাযিল হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় :** এটা ওহি নাযিলের প্রথম পদ্ধতি। রাসুলের নিকট অধিকাংশ সময় এ পদ্ধতিতে ওহি নাযিল হতো। ওহি নাযিলের পূর্বে প্রথমে বিরতিহীনভাবে ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ আসতে থাকত। মহানবি (সা.) নিজ কানে শুনতেন। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) তীব্র শীতের মধ্যেও ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন। তিনি আরোহী অবস্থায় থাকলে শক্তিশালী উটও ওহির ভার বহন করতে না পেরে বসে পড়ত। ওহি নাযিলের এ পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর ছিল।

২. **মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন:** হযরত জিবরাইল (আ.) কখনো কখনো মানুষের আকৃতিতে ওহি নিয়ে আসতেন। অধিকাংশ সময় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত দাহিয়াতুল কালবি (রা.)-এর আকৃতিতে জিবরাইল (আ.) আগমন করতেন। এ পদ্ধতিতে ওহি রাসুল (সা.) এর জন্য তুলনামূলক সহজ ছিল।

হাদিসে এসেছে,

وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا

অর্থ: আর কখনো কখনো আমার কাছে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আসতেন। (বুখারি)

৩. **জিবরাইল (আ.)- এর নিজস্ব আকৃতিতে আগমন:** কখনো কখনো হযরত জিবরাইল (আ.) অন্য কোনো রূপ ধারণ না করে সরাসরি নিজ আকৃতিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহি নিয়ে আগমন করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে এরূপ ঘটনা তিন বার ঘটে। প্রথমবার হেরা গুহায় কুরআনের প্রথম ওহি নিয়ে নিজ আকৃতিতে আগমন করেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজ রজনীতে, তৃতীয়বার মহানবি (সা.) জিবরাইল (আ.)-কে আসল রূপে দেখার ইচ্ছা পোষণ করায় তিনি নিজস্ব আকৃতিতে আগমন করেছিলেন।

৪. **সত্য স্বপ্ন যোগে:** মহানবির প্রতি ওহি নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। কুরআন নাযিলের পূর্বে তিনি যা স্বপ্নে দেখতেন, তা-ই ছিল ওহি। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওহির সূচনা হয়েছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যখনই কোনো স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রত্যুষের আলোর ন্যায় বাস্তবে প্রতিফলিত হতো।'

৫. **আল্লাহ তা'আলার সরাসরি কথোপকথন:** ওহি নাযিলের আর একটি পদ্ধতি ছিল, কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপ। এই পদ্ধতিকে বলা হয় কালামে ইলাহি। মি'রাজ রজনীতে মহানবি (সা.) সরাসরি মহান আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। এ সময়ই উম্মাতে মুহাম্মাদির প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে।

৬. **সরাসরি হৃদয়পটে ওহি ঢেলে দেওয়া:** হযরত জিবরাইল (আ.) কখনো সামনে না এসে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে আল্লাহর বাণী ফুঁকে দিতেন। এক হাদিসে মহানবি (সা.) নিজেই বলেছেন, 'হযরত জিবরাইল (আ.) আমার মানসপটে ফুঁকে দিয়েছেন।'

৭. **হযরত ইসরাফিল (আ.)- এর মাধ্যমে ওহি প্রেরণ:** কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফিল (আ.)- এর মাধ্যমে মহানবি (সা.)-এর ওপর ওহি নাযিল করতেন।

ওহির গুরুত্ব

ওহির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। এতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। ওহি মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের শান্তি এবং কল্যাণের বার্তা নিয়ে আসে। এ বার্তা গ্রহণকারীর জন্য ওহি কল্যাণকর পথ সহজ করে দেয়। আর যারা ওহিকে অবিশ্বাস করে কিংবা অবজ্ঞা করে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত অগণিত নবি-রাসুল আগমন করেছেন। নবি-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মতো ওহির প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ

নবি মুহাম্মাদ (সা.)- এর মতো পূর্ববর্তী নবিদের ওপর অবতীর্ণ ওহিকেও সত্যবাণী হিসেবে মেনে নেওয়া ইমানের অংশ।

আল কুরআনের মু'জিযা

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান এবং তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশের জন্য অসংখ্য নবি-রাসুলকে মু'জিযা দিয়ে প্রেরণ করেন। মু'জিযা আরবি শব্দ। এর অর্থ–অলৌকিক বা বিশেষ ক্ষমতা, অন্যকে অক্ষম করে দেওয়া। মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা। প্রত্যেক নবির গোত্রের অবস্থা অনুপাতেই তার মু'জিযা হয়ে থাকে। ফির'আউন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদু বিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই মুসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা একটি লাঠি দিয়ে পাঠালেন, যা যাদুকরদের সাপ সদৃশ সব লাঠি গিলে ফেলল। এতে যাদুকররা বিস্মিত হলো। তারা বিশ্বাস করে নিলো যে, মুসা (আ.) যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য-সঠিক; যাদু নয়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে মানুষ যখন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মুজিযা দিয়ে পাঠালেন, যা দেখে সে যুগের চিকিৎসকগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি মৃতদের আল্লাহর হুকুমে জীবিত করতেন এবং জটিল ও কঠিন রোগ ভালো করতেন। যেমন, তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতে পারতেন এবং মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে আল্লাহর নামে ফুঁ দিলেই তা পাখি হয়ে যেত। এতে চিকিৎসকদের বিবেক-বুদ্ধি স্বীকার করে নিল যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই।

আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে আরব জাতির নিকট প্রেরণ করেন। আরবরা বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিল। আরবি ভাষা চর্চার মাধ্যমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। বাকপটুতা ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান দিয়ে ভাষণ-বক্তৃতা দিত। তারা বর্তমান যুগের মতো ভাষাচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রতিযোগিতা করত এবং বিজয়ীদের বিশেষ সম্মান দিত ও পুরস্কৃত করত। এ সময় আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট আরবি সাহিত্য শেষ আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেন। আল-কুরআনের ভাষাশৈলী দেখে কাফির-মুশরিকরা এর তাৎপর্য অনুধাবন করলেও সাধারণ মানুষের কাছে অপপ্রচার চালাতে লাগল যে, মুহাম্মাদ (সা.) যাদুকর। তাঁর কাছে গেলে কুরআনের মাধ্যমে সে মানুষদের মোহগ্রস্ত করে ফেলবে। তারা মানুষের কাছে অপপ্রচার করলেও নিজেরা কুরআনের ভাষার অলংকার, বর্ণনা ভঙ্গি ও বাক্য গঠন প্রণালি অনুধাবন করে লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের আঁধারে তা শোনার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরের আশেপাশে অবস্থান করত। আবার দিনের বেলায় তারা প্রচার করত যে, আমরাও কুরআনের মতো আয়াত রচনা করতে পারি। তাদের এমন উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ
وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থ: আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো, তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং আল্লাহকে ছাড়া নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনোই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য। (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৩-২৪)

আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব অথবা কুরআনের সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেছেন। আজ পর্যন্ত কুরআনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও ইসলামে অবিশ্বাসীরা কখনো কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব কিংবা কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে আনতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○

অর্থ: হে নবি আপনি বলুন, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৮৮)

মানুষ যেহেতু কুরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করতে পারেনি, তাই বুঝা যায় যে, কুরআন একটি চিরন্তন মু'জিযা। বিভিন্ন পদ্ধতিতেই কুরআনুল কারিমের মু'জিযা প্রমাণ করা যায়, কুরআনের শব্দমালা, গ্রন্থনা, অলংকারপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রতি নির্দেশনা প্রদান, আদেশ-নিষেধ, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির সংবাদ প্রদান, তার ফেরেশতাদের খবরাদি, ভবিষ্যৎ ও অতীতের গায়েবি বিষয়-সম্পর্কিত খবর, পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্ত খবর, ইমান ও ইয়াকিনের দলিল-প্রমাণাদি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আর্ন্তজাতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিসহ বিজ্ঞানের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, মুসলিম জাতি আজ এ চিরন্তন মু'জিযা আল-কুরআনকে পরিত্যাগ করার কারণে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিগৃহীত জীবনযাপন করছে। অথচ আল-কুরআনের প্রথম নির্দেশই হচ্ছে 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে'। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে পড়তে, বুঝতে ও তা থেকে উপকার গ্রহণ করতে বলেছেন। তাই মানবজাতির হেদায়াত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের জন্য সকলকে কুরআন পড়তে হবে।

প্যানেল আলোচনা

'আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'

'কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা আমি/আমরা যেভাবে অনুশীলন করতে পারি'

(উল্লিখিত শিরোনামগুলোর আলোকে তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

জ্ঞানের উৎস হিসেবে আল কুরআন

মহাগ্রন্থ আল কুরআন জ্ঞানের ভাণ্ডার। কুরআন যারা মানেন এবং যারা মানেন না, সকলে কুরআনের বিভিন্নমুখী হেদায়াত থেকেই আলো নিয়েছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসই হলো আল-কুরআন। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নেই। এতে রয়েছে ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যা, শরীর তত্ত্ববিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি। আরো রয়েছে জীবনের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখাগত বিজ্ঞান। সে হিসাবে কুরআনের প্রতিটি আয়াতই বিজ্ঞান বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ২) যেহেতু কুরআন হলো সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস, তাই এখানে বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ করে এর গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কুরআন থেকে বিজ্ঞানের চর্চা করেই মুসলমানরা কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রনায়ক ছিল। অতঃপর বাগদাদ ও স্পেনের রাজনৈতিক পতনের ফলে বিজ্ঞানেরও পতন ঘটে এবং তাদেরই রেখে যাওয়া বিজ্ঞান অনুসরণ করে বস্তুবাদী ইউরোপ আজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে। শিক্ষার্থীরা এখানে আল কুরআন যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস তার কয়েকটি নমুনা আলোচনা করা হবে।

ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যা

ভ্রূণতত্ত্বের মূলে আল্লাহ পাকের ওহি হলো, 'পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।' (সূরা আলাক্ব, আয়াত: ১-২) আরবি শব্দ 'আলাক' অর্থ জমাট রক্ত। অন্য অর্থ দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে এমন আঠালো জিনিস। যেমন, জোঁক কামড় দিয়ে আটকে থাকে। এভাবেই ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে অজানা অনেক জ্ঞান কুরআন থেকে পাওয়া যায়।

মানুষের সৃষ্টি রহস্য

মানুষের সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া তত্ত্বের উল্লেখ করে কুরআনের সূরা তারিক এর ৫-৭ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, 'সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে, কোন বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হয়ে আসা পানি থেকে। যা বের হয় মেরুদন্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝখান থেকে।'

সকল প্রাণীর সৃষ্টি রহস্য

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পানি থেকেই প্রাণিজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন এ কথা আগেই বলেছে,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

অর্থ: আমরা প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি থেকে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩০)।

বিজ্ঞানের উৎস অনুমিতি

বিজ্ঞানের উৎস অনুমিতি যা যেকোনো সময় ভুল প্রমাণিত হতে পারে। যেমন বিজ্ঞানীরা বলেন, Science gives us but a partial knowledge of reality 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'। তারা শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে থাকেন। তাঁরা বলেন, 'আমরা কতিপয় বাহ্য প্রকাশকে দেখি মাত্র, মূল বস্তুকে দেখি না'। যেমন ধোঁয়া দেখে মানুষ আগুনের সন্ধানে ছুটে থাকে। কিন্তু আল্লাহর ওহি হিসেবে কুরআন বিজ্ঞানের উৎস। যেখানে ভুলের কোনো অবকাশ নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۖ
تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

অর্থ: সম্মুখ থেকে বা পিছন থেকে এর মধ্যে মিথ্যার কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এটি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হতে। (সূরা হা-মীম-আস্-সাজদা, আয়াত: ৪১-৪২)

জগত সৃষ্টির রহস্য

বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান বলে, 'কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বজগৎ একটি অখণ্ড জড়বস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল। পরে তার কেন্দ্রে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে, যাকে Big-Bang বলা হয়। সেই মহা বিস্ফোরণের ফলে আমাদের সৌরজগৎ, ছায়াপথ, তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ

অর্থ: অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩০)

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির রহস্য

বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি প্রাণসত্তার মধ্যে রয়েছে বিপরীতধর্মী দুটি শক্তির জোড়। যার একটি পজিটিভ বা প্রোটন এবং অপরটি নেগেটিভ বা ইলেকট্রন। এমনকি বিদ্যুতের মতো প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এই জোড়ার সম্পর্ক। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য দিয়ে বলেছে, ‘মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি ভূ-উৎপন্ন সকল বস্তু এবং মানুষ ও তাদের অজানা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছে’ (সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩৬)।

উদ্ভিদের প্রাণ থাকা

উদ্ভিদের জীবন আছে, একথা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খ্রি.) মাত্র কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কার করলেন। অথচ এর বহু পূর্বেই একথা কুরআন বলে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘নক্ষত্ররাজি ও উদ্ভিদরাজি আল্লাহকে সিজদাহ করে’ (সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৬)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানে পাথর ও বৃক্ষসমূহ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে এবং তাঁকে সালাম দিয়েছে। এ সবই উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ বহন করে।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে প্রাণের অস্তিত্ব

কুরআন এমন বিস্ময়কার তথ্য প্রকাশ করেছে, যা বিজ্ঞানীরা আজও প্রমাণ করতে পারেনি। আর তা হলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রাণ আছে এবং আছে বোধশক্তি। এমনকি এরা সর্বদা আল্লাহর গুণগান করে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রবিশেষ। অনন্তর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত: ১১)

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে কুরআনের কোনো বিরোধ নেই, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যত উৎকর্ষ সাধিত হবে কুরআন যে বিজ্ঞানের উৎস তা দ্রুত বাস্তব উপলব্ধিতে আসবে। নতুন প্রজন্মকে যথাযথ উৎসাহ, সাহস এবং প্রযুক্তির সঠিক জ্ঞান দিলে তাঁরাই জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে সিনা, মূসা আল খাওয়ারিজমি, আল-রাজির মতো বিশ্ববরেণ্য ইসলামিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে জ্ঞানচর্চায় অবদান রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

একক কাজ

জ্ঞানের উৎস হিসেবে আল-কুরআনের সপক্ষে যুক্তি বা বাণী (আয়াত) উল্লেখপূর্বক ভিপ কার্ড বা পোস্টার তৈরি করো।

তাজবিদ

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদাত। যিনি কুরআনের একটি হরফ পড়বেন, তিনি ১০টি নেকি পাবেন। কুরআনের পাঠক ও শিক্ষক সর্বোত্তম মানব। কুরআন তিলাওয়াতকারীর মাতা-পিতাও সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী। মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে। এ মুকুটের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি হবে। কিয়ামতের কঠিন দিনে কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তা'আলা এ সুপারিশ কবুল করবেন।

কুরআন তিলাওয়াতের এ ফযিলত অর্জন করতে হলে সহিহ-শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। আর এ জন্য তাজবিদের জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

তাজবিদ অর্থ সুন্দর বা উত্তম করা। কুরআন মাজিদের প্রতিটি হরফকে তার সিফাত অনুযায়ী নিজস্ব মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার নাম তাজবিদ।

আরবি হরফের উচ্চারণের স্থানসমূহকে মাখরাজ বলে। অর্থাৎ যে হরফ যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয়, তাকে সে হরফের মাখরাজ বলে। আরবি ২৯টি হরফের মোট ১৭টি মাখরাজ রয়েছে।

আরবি হরফের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গি রয়েছে। যেমন: কোনো হরফ উচ্চারণের সময় শ্বাস চালু থাকে আবার কোনো হরফের সময় শ্বাস চালু থাকে না। কোনো হরফের উচ্চারণ কোমল আবার কোনো হরফের উচ্চারণ একটু কঠিন। হরফের এ ধরনের বিভিন্ন গুণকে সিফাত বলে।

অতএব বলা যায়, কুরআন মাজিদের প্রতিটি হরফের মাখরাজ ও সিফাত অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করাকে তাজবিদ বলা হয়।

তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত না করলে অনেক সময় অর্থের পরিবর্তন ঘটে, ফলে পাঠকারী গুনাহগার হয়। তার নামায বিশুদ্ধ হয় না। মহান আল্লাহ বিশুদ্ধরূপে ধীরস্থিরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ: 'আপনি ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন।' (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪)

তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সুতরাং আমরা তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করব। তাজবিদের নিয়মকানুন ভালোভাবে জানব।

পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে তোমরা তাজবিদের বেশ কিছু নিয়ম জেনেছ। তারই ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে গুন্নাহ, কলকলাহ, আল্লাহ শব্দের লাম পড়ার নিয়ম ও রা হরফ পড়ার নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

জোড়ায় কাজ

'পূর্ববর্তী শ্রেণির (৬ষ্ঠ-৮ম) তাজবিদের পুনরালোচনা'

(প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক পূর্বের শ্রেণিতে তাজবিদ বিষয়ক যা যা শিখেছ, তা তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে উপস্থাপন করো)।

গুন্নাহ

গুন্নাহ কুরআন মাজিদ বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের একটি বিশেষ নিয়ম। গুন্নাহ অর্থ নাকে বাজিয়ে উচ্চারণ করা। আরবি হরফের আওয়াজকে নাকের বাঁশিতে নিয়ে উচ্চারণ করাকে গুন্নাহ বলে। গুন্নাহের পরিমাণ এক আলিফ। একটি আঙুলকে সোজা করে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়কে এক আলিফ পরিমাণ সময় ধরা হয়।

গুন্নাহ মোট চার প্রকার। যথা: ১। ক্বলব গুন্নাহ ২। ইখফা গুন্নাহ ৩। ইদগামে বা-গুন্নাহ ও ৪। ওয়াজিব গুন্নাহ।

১. ক্বলব গুন্নাহ

ক্বলব অর্থ পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানবীনের পর বা (ب) হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে মিম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহসহ পড়তে হয়। এটাকে ক্বলব গুন্নাহ বলা হয়। যেমন:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مِنۢ بَأۡسٍ	سَمِيۡعٌۢ بَصِيۡرٌ
نۡ + ب এখানে নুন সাকিনের পর ب এসেছে।	ـٌ + ب এখানে তানবীনের পর ب এসেছে।
جَنۢبٌ	خَبِيۡرًاۢ بَصِيۡرًا

২. ইখফা গুন্নাহ

ইখফা অর্থ গোপন করা, অস্পষ্ট করা। নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফার জন্য নির্দিষ্ট যেকোনো একটি আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে নাকের মধ্যে গোপন করে গুন্নাহর সঙ্গে পড়তে হয়। এটাকেই ইখফা গুন্নাহ বলে। ইখফার হরফ ১৫টি। যেমন: ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
لَنْ تَفْعَلُوْا	قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ
نْ + ت এখানে নুন সাকিনের পর ت এসেছে।	ٌ + ت এখানে তানবীনের পর ت এসেছে।
مَنْ جَآءَ	ذَرَّةٍ شَرًّا

এছাড়াও মীম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফটি আসলে উক্ত মীম সাকিনকে গুন্নাহসহ পড়তে হয়। এটাকে মীম সাকিনের ইখফা গুন্নাহ বলে। যেমন-

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

৩. ইদগামে বা-গুন্নাহ (গুন্নাহসহ ইদগাম)

ইদগাম শব্দের অর্থ মিলানো বা সন্ধি করা। ن -م -و -ي (ইয়া, ওয়াও, মীম, নুন) এই চারটি হরফের কোনো একটি নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ভিন্ন শব্দের শুরুতে আসলে উক্ত নুন সাকিন কিংবা তানবীন যুক্ত হরফকে পরবর্তী শব্দের প্রথম শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে গুন্নাহর সঙ্গে পড়তে হয়। এটাকে বলে ইদগামে বা গুন্নাহ। যেমন-

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مَنْ يَّفْعَلُوْا	قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ
نْ + ي এখানে নুন সাকিনের পর ي এসেছে।	ٌ + ي এখানে তানবীনের পর ي এসেছে।
مِنْ مَّالٍ	رِجَالًا وَّعَلٰى

৪. ওয়াজিব গুন্নাহ

م – ن (মীম ও নুন) এ দুটি হরফের উপর যদি তাশদিদ (ـّ) থাকে, তবে এ দুটিকে অবশ্যই গুন্নাহর সঙ্গে পড়তে হবে। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়। যেমন: لَمَّا - إِنَّ - جَهَنَّمَ ইত্যাদি।

কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সামনে সঠিকভাবে গুন্নাহ আদায় করতে পারে কি না, তার অনুশীলন করবে।

আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লাম (ل) উচ্চারণের নিয়ম

الله (আল্লাহ) শব্দের লাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি দুটি।

১. اَللّٰهُ (আল্লাহ) শব্দের লাম হরফের পূর্বে যবর বা পেশ থাকলে উক্ত লামকে পোর করে অর্থাৎ মোটা স্বরে পড়তে হবে। যেমন:

وَاللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ - وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ

২. যদি লামের পূর্বে যের বিশিষ্ট হরফ থাকে তবে উক্ত লামকে বারিক বা পাতলা স্বরে পড়তে হবে। যেমন:

لِلّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ -وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ

আল্লাহ শব্দ ছাড়া যত শব্দে লাম আছে সব লাম বারিক বা পাতলা করে পড়তে হবে। যেমন:

مَا وَلّٰهُمْ

রা (ر) হরফ পড়ার নিয়ম

রা (ر) হরফ পড়ার দুটি নিয়ম আছে। যথা:

১. পোর বা মোটা
২. বারিক বা পাতলা।

নিম্নলিখিত অবস্থায় রা (ر) হরফকে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) রা (ر) হরফ এর ওপর যবর বা পেশ থাকলে তা পোর করে পড়তে হয়। যেমন: رُقُوْدٌ – رَسُوْلٌ

(২) রা (ر) সাকিন এর পূর্বের হরফের ওপর যবর বা পেশ থাকলে তা পোর করে পড়তে হয়। যেমন:

أُرْكُسُوْا – يَرْجِعُوْنَ

(৩) রা (ر) সাকিন এর পূর্বের হরফে অস্থায়ী যের থাকলে তা পোর করে পড়তে হয়। আর যে অক্ষরে পূর্বে সাকিন ছিল কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার জন্য সাময়িকভাবে যের দেওয়া হয়েছে, এমন যের কে অস্থায়ী যের বলে। যেমন: مَنِ ارْتَضٰى - إِنِ ارْتَبْتُمْ

(৪) রা (ر) সাকিন এর পূর্বের হরফে যের এবং পরে ইসতি'লার কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত রা (ر) কে পোর করে পড়তে হয়। যেমন, قِرْطَاسٌ - مِرْصَادٌ

ইসতি'লার হরফ সাতটি। যথা: خ-ص-ض-غ-ط-ق-ظ

এ গুলোকে একত্রে বলা হয় خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

(৫) রা (ر) হরফে যদি ওয়াকফ করা হয় এবং এটির পূর্বে ইয়া (ي) ব্যতীত অন্য কোনো হরফ সাকিন থাকে, আর উক্ত সাকিনের পূর্বাক্ষরে যবর বা পেশ থাকে, তাহলে রা (ر) কে পোর করে পড়তে হয়। যেমন:

قَدْرٌ- خُسْرٌ- شَهْرٌ

নিম্নলিখিত অবস্থায় রা (ر) হরফকে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়।

(১) রা (ر) হরফে যের হলে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন: رِزْقٌ

(২) রা (ر) সাকিন এর পূর্বের হরফ স্থায়ী যের হলে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন: مِرْفَقًا

(৩) রা (ر) হরফে ওয়াকফ করার সময় এর পূর্বে ইয়া (ي) সাকিন থাকলে উক্ত রা (ر) বারিক করে পড়তে হয়। যেমন: سَعِيْرٌ - خَيْرٌ - خَبِيْرٌ

(৪) রা (ر) হরফে ওয়াকফ করার সময় যদি এর পূর্বে ইয়া (ي) ব্যতীত অন্য কোনো হরফ সাকিন হয় এবং সেই সাকিন হরফের পূর্বাক্ষরে যের হয়, তা হলে উক্ত রা (ر) বারিক করে পড়তে হয়। যেমন: حِجْرٌ - شِعْرٌ

কলকলার বিবরণ

কলকলা অর্থ প্রতিধ্বনি। কলকলার অক্ষর ৫টি। যথা: ق ط ب ج د মনে রাখার জন্য এগুলোকে একত্রে قُطْبُ جَدٍّ বলা হয়। এই পাঁচটি হরফে যখন সাকিন বা ওয়াকফ হয় তখন কলকলা করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিধ্বনির মতো আওয়াজ বন্ধ হয়ে পুনরায় ফিরে আসাকে সাধারণত কলকলা বলা হয়। যেমন কোনো শক্ত জিনিসকে শক্ত মাটির ওপর নিক্ষেপ করলে নিক্ষিপ্ত বস্তু শব্দ করে ফিরে আসে, ঠিক তেমনিই কলকলার হরফকেও কলকলা করার সময় নির্দিষ্ট মাখরাজ হতে প্রতিধ্বনির মতো আওয়াজ বন্ধ হয়ে পুনরায় উচ্চারিত হয়, তাকে কলকলা বলে।

শব্দের মধ্যভাগে কলকলার হরফ সাকিন হলে সামান্য কলকলা করতে হয় এবং কিছুটা যবরের মতো করে পড়তে হয়। যেমন: يَقْطَعُوْنَ - قِطْمِيْرُ - يَبْخَلُوْنَ - تَجْهَلُوْنَ - يَدْخُلُوْنَ ইত্যাদি।

কলকলার হরফগুলো যদি ওয়াকফ অবস্থায় থাকে, তাহলে পূর্ণভাবে কলকলা করতে হয় এবং কিছুটা যবরের মতো করে আদায় করতে হয় যেন পুরা মাত্রায় যবর প্রকাশ না পায়। যেমন:

خَلَّاقٌ - صِرَاطٌ - حِسَابٌ - شَدِيْدٌ - جُحُوْدٌ ইত্যাদি।

বাড়ির কাজ

'পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত সূরাসমূহ তাজবিদ অনুসারে তুমি বাড়িতে শুদ্ধভাবে চর্চা করো' (এক্ষেত্রে তুমি তাজবিদ সংক্রান্ত বিষয়ে তোমার পরিবার, প্রতিবেশি বা সহপাঠীদের মধ্যে কেউ দক্ষ থাকলে তার সহায়তা নিতে পারো)।

অর্থ ও পটভূমিসহ আল কুরআনের কতিপয় সূরা

সূরা আল-ফীল (سُوْرَةُ الْفِيْلِ)

সূরা ফীল কুরআন মাজিদের ১০৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। সূরাটিতে পাঁচটি আয়াত রয়েছে। ফীল অর্থ হাতি। এ সূরায় হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ইয়েমেনের শাসক আবরাহা কাবা ঘরকে ধ্বংস করার জন্য হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান করেছিল। আল্লাহ তা'আলা ছোট ছোট পাখির দ্বারা তাদের বাহিনীকে ধ্বংস করে ধুলায় মিশিয়ে দেন। সূরাটিতে হস্তিবাহিনীর এ করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে সূরা ফীল।

শানে নুযুল

ইয়েমেনের রাজা ছিল জুনুওয়াস। সে ছিল ইহুদি। খ্রিস্টানদের সে অকথ্য নির্যাতন করত। তাদের জোর করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করত। এমনকি সে ইনজিলের কপি পুড়িয়ে দিয়েছিল। তখন রোমের বাদশাহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশিকে জুনুওয়াসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। নাজ্জাশি তখন আবরাহা নামক এক ব্যক্তিকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ জুনুওয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আবরাহা জুনুওয়াসকে ধ্বংস করে এবং ইয়েমেনের ক্ষমতা দখল করে নেয়।

ইয়েমেনের অধিপতি হয়ে আবরাহা দেখল আরব, ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশের জনগণ মক্কায় অবস্থিত কাবা প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে কাবাকে তাওয়াফ করে, সম্মান ও ভক্তি করে। তাই কাবার প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা যাতে কমে যায়, পৃথিবীর মানুষ যেন কাবার কাছে না যায়, সে জন্য সে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তখন সে ইয়েমেনের রাজধানী সান'আ শহরে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করল। মানুষকে সে এ গির্জায় হাজির হতে নির্দেশ দিল এবং মক্কায় কাবা শরিফে না যাওয়ার জন্য তাগিদ দিল। কিন্তু তার শত চেষ্টা ও উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। কেউ তার গির্জায় যেতে রাজি হলো না। সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এরই মধ্যে আরবের কোনো এক ব্যক্তি গোপনে ঐ গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে মলত্যাগ করে রাখে। এরপর কে বা কারা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন আবরাহা রাগে ও ক্ষোভে কাবা ঘর ভেঙে ফেলার জন্য ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে অভিযান শুরু করে। এ বাহিনীতে বিপুল সৈন্য ও তেরোটি বিশালাকায় শক্তিশালী হাতি ছিল। পথিমধ্যে আরবের যে গোত্রই তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, সে তাদেরকে ধ্বংস করে সামনে অগ্রসর হয়। তখন কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন মহানবি (সা.)-এর দাদা কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিব। আবরাহার

সৈন্যরা মক্কাবাসীদের উটগুলো নিয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দুইশ উটও ছিল। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, তোমার সৈন্যবাহিনী আমাদের উটগুলো আটক করেছে, সেগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করো। এতে আবরাহা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। সে বলল, আমি তোমাদের কাবা ঘর ভেঙে ফেলার জন্য এসেছি, কিন্তু তোমরা সে ব্যাপারে কোনো কথা না বলে তোমাদের উটের কথা বলছ। তখন আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আমি উটের মালিক, তাই উটের কথা বলছি আর কাবা ঘরের মালিক মহান আল্লাহ, তিনি তা অবশ্যই রক্ষা করবেন।' এ কথা শুনে আবরাহা কিছুক্ষণ নীরব থেকে উটগুলো ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিল। আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। সকলে নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন সকালে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে হাতিগুলো সামনে অগ্রসর হতে পারল না। এ সময় মহান আল্লাহ সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ ও হলুদ রঙের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাবিল পাখি প্রেরণ করেন। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে একটি করে ক্ষুদ্র কংকর নিয়ে এসে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর উপরে নিক্ষেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। তার সমস্ত শরীরে বসন্তের দাগের ন্যায় জখম হয়ে গেল। তার দেহ পচে রক্ত ও পুঁজ বের হতে লাগল। অতিশয় কষ্টের পর সে মারা গেল। এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর ঘরকে আবরাহার ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে রক্ষা করেন। উক্ত প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফীল নাযিল করেন এবং বিশেষ ঘটনা জগৎবাসীকে জানিয়ে দেন।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
أَلَمْ تَرَ	আপনি কি দেখেননি?	أَرْسَلَ	তিনি প্রেরণ করেন
كَيْفَ	কীভাবে, কীরূপে	طَيْرًا	পাখি
أَصْحٰبِ	সঙ্গীগণ, সাথিগণ, অধিপতি, মালিক	أَبَابِيْلَ	আবাবিল, একপ্রকার ছোট পাখি যা ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে
اَلْفِيْلِ	হাতি	حِجَارَةٍ	পাথর
اَلَمْ يَجْعَلْ	তিনি কি করেননি?	سِجِّيْلٍ	কংকর, নুড়িপাথর
كَيْدَ	ষড়যন্ত্র, গোপন চক্রান্ত, কৌশল	عَصْفٍ	তৃণ, খড়-কুটো
تَضْلِيْلٍ	ব্যর্থতা, ব্যর্থ করে দেওয়া	مَّأْكُوْلٍ	ভক্ষিত, যা ভক্ষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ ؕ	১. আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন?
اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ ۙ	২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?
وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ ۙ	৩. আর তিনি তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি প্রেরণ করেন।
تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ	৪. সেগুলো তাদের উপর কংকর- জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করে।
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ ࣖ	৫. অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণসম করেন।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক কাবা ঘর ধ্বংসের ব্যর্থ চেষ্টা নস্যাৎ করার ঐতিহাসিক ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের অপূর্ব নিদর্শন। মহানবি (সা.)- এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটে। আবরাহা অনেক ধন-সম্পদ ও সৈন্য-সামন্তের মালিক ছিল। তার বিশাল হস্তিবাহিনী ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার তুলনায় এসব সম্পদ ও সৈন্য-সামন্ত অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে পারেন।

আবরাহা ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়েছিল। গর্ব ও অহংকারবশত মহান আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করেছিল। মহান আল্লাহ তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখির সাহায্যে ধ্বংস করে দেন। এ ঘটনায় বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানি করবে, ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহাকে তার সৈন্য ও হস্তি বাহিনীসহ ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে মহান আল্লাহ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি যে-ই ইসলামের ক্ষতি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। শুধু দুনিয়াতেই নয়, আখিরাতেও তারা মহান আল্লাহর ভয়াবহ আযাব থেকে রেহাই পাবে না।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই—

১. কাবা মহান আল্লাহর ঘর, আর এটি সংরক্ষণ তিনিই করবেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি এটি ধ্বংস করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।
২. মহান আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা অসীম। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।
৩. যারাই মহান আল্লাহর নাফরমানি করবে, তিনি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবেন।
৪. আল্লাহদ্রোহী ও নাফরমানদের শাস্তি শুধু পরকালেই হবে, তা নয় বরং দুনিয়াতেও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।
৫. ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সমস্ত কৌশল ও ষড়যন্ত্র মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কেননা তিনিই সর্বোত্তম কৌশলী।

সূরা আল-কদর (سُوْرَةُ الْقَدْرِ)

সূরা আল-কদর পবিত্র কুরআনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সূরা। এটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি কুরআনের ৯৭তম সূরা। এতে পাঁচটি আয়াত আছে। এতে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এই রাতের ইবাদাত হাজার মাসের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম। এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত লাইলাতুল কদর শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

শানে নুযুল

কুরআন মাজিদের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বোঝানোই এ সূরা নাযিলের উদ্দেশ্য। ইবন জারির (রহ.) এ সূরার শানে নুযুলের ব্যাপারে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদাতে নিয়োজিত থাকতেন। আর সকাল হলেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়ে যেতেন এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত থাকতেন। তিনি এভাবে এক হাজার মাস আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তখন সাহাবিগণ বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, আমাদের হায়াত খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ববর্তী উম্মতগণ দীর্ঘদিন জীবিত থাকতেন। বেশি বেশি ইবাদাত করার সুযোগ পেতেন। ফলে আমরা কখনই ইবাদাতের সাওয়াবের ক্ষেত্রে তাদের সমান হতে পারব না। সাহাবিগণের এমন আফসোসের পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ সূরা কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। সাহাবিগণ বনি ইসরাইলের উম্মতদের ইবাদাত-বন্দেগির কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ এর চেয়েও উত্তম বস্তু এ সূরার মাধ্যমে তাদের দান করেছেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اِنَّا	নিশ্চয় আমি	شَهۡرٍ	মাস
اَنۡزَلۡنٰهُ	আমি এটি নাযিল করেছি	تَنَزَّلُ	অবতীর্ণ হয়, নাযিল হয়, অবতরণ করে
لَيۡلَةِ	রজনী, রাত	اَلۡمَلٰٓئِكَةُ	ফেরেশতাগণ
اَلۡقَدۡرِ	মর্যাদা, মহান	اَلرُّوۡحُ	আত্মা। কিন্তু এখানে হযরত জিবরাইল (আ.) কে বোঝানো হয়েছে।
وَمَآ اَدۡرٰىكَ	আর আপনি কি জানেন?	اِذۡنِ	অনুমতি, অনুমোদন
مَا	কি?	سَلٰمٌ	শান্তি
لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ	মহিমান্বিত রাত	حَتّٰى	পর্যন্ত, যতক্ষণ না
خَيۡرٌ	উত্তম, সর্বোত্তম	مَطۡلَعِ	আবির্ভাব, উদয়
اَلۡفِ	সহস্র, হাজার	اَلۡفَجۡرِ	প্রভাত, ফজরের সময়, উষা

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।
إِنَّآ أَنۡزَلۡنٰهُ فِيۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ ۝	১. নিশ্চয়ই আমি এটি (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে।
وَمَآ أَدۡرٰىكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۝	২. আর আপনি কি জানেন এ মহিমান্বিত রাত কী?
لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۙ خَيۡرٌ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٍ ۝	৩. মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۛ ۝	৪. সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল ফেরেশতা) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।
سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝	৫. সে রাতে উষা উদয় হওয়া পর্যন্ত শান্তিই শান্তি (বিরাজ করে)।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় কুরআন মাজিদ নাযিলের কথা এবং সে রাতের মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন নাযিল করা হয়েছে লাইলাতুল কদরে। লাইলাতুল কদরে কুরআন নাযিলের অর্থ, এ রাতে সমস্ত কুরআন এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে। লাওহে মাহফুয থেকে সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম আসমানের বায়তুল ইযযাহ নামক স্থানে নাযিল করা হয়েছিল। লাইলাতুল কদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রাত। এ রাতের মর্যাদা এক হাজার মাসের চেয়েও বেশি। এই একটি রাতের ইবাদাত একাধারে তিরাশি বছর চার মাস ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। এ রাতে হযরত জিবরাইল (আ.) অন্যান্য ফেরেশতাগণসহ মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে রহমত, বরকত ও শান্তির বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এ রাতে ফজর হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই :

১. কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর কালাম বা বাণী। এটি তিনি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছেন।
২. লাইলাতুল কদর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাত।
   তবে লাইলাতুল কদর কোনটি এ সম্পর্কে হাদিসের ইঙ্গিত হলো এই যে, রমযান মাসের শেষ দশকের কোনো এক বেজোড় রাতই লাইলাতুল কদর। আবার বিশেষজ্ঞ আলিমগণের অনেকেই রমযান মাসের ২৭তম রাতকে অর্থাৎ ২৬তম দিবাগত রাতকে লাইলাতুল কদর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।
৩. এ রাতের ইবাদাত হাজার মাসের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।
৪. এ রাতে জিরাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাগণ শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেন।
৫. এ রাতে ফজর উদিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়।
৬. লাইলাতুল কদরে কুরআন মাজিদ নাযিলের কারণেই তা এত মর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

আমরা বেশি বেশি নফল ইবাদাত বন্দেগির মাধ্যমে যথাযথভাবে লাইলাতুল কদর উদযাপন করব। এ রাতের সামান্য সময়ও ইবাদাত না করে অতিবাহিত করব না। তাহলেই আমরা হাজার মাস অপেক্ষা বেশি ইবাদাতের সাওয়াব অর্জন করতে পারব।

দলগত কাজ

'সুরা কদর' এর শিক্ষা অনুযায়ী কদরের রাতে আমাদের কী করা উচিত

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো।)

সূরা আদ-দুহা (سُوْرَةُ الضُّحٰى)

সূরা আদ-দুহা কুরআন মাজিদের তিরানব্বই নম্বর সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা এগারো। সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সূরা ফাজরের পর এবং সূরা ইনশিরাহ এর আগে। রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মাক্কি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল

এ সূরার শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, ওহি অবতীর্ণের প্রাথমিক সময়ে কিছু দিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ওহি আসা বন্ধ ছিল। এতে মহানবি (সা.) খুব চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। মক্কার কাফির এবং মুশরিকরা তখন বলতে শুরু করল, মুহাম্মাদের (সা.) প্রভু তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আদ-দুহা অবতীর্ণ করেন।

সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমে সূরা আদ-দুহার আরেকটি শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কয়েকদিন জিবরাইল (আ.) ওহি নিয়ে আসেননি। তখন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল (উরওয়া বিনতে হারব) এসে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে যে শয়তানটা থাকত, সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুই বা তিন রাত আমি তাকে তোমার কাছে আসতে দেখছি না।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
وَ	শপথ,	يُعْطِيْكَ	তিনি আপনাকে দান করবেন
اَلضُّحٰى	পূর্বাহ্ন, দিবসের প্রথম ভাগ	تَرْضٰى	আপনি সন্তুষ্ট হবেন
اَلَّيْلِ	রাত	اَلَمْ يَجِدْكَ	তিনি কি আপনাকে পাননি?

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اِذَا	যখন	يَتِيْمًا	ইয়াতিম, অনাথ, আশ্রয়হীন
سَجٰى	নিঝুম হওয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া	فَاٰوٰى	অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন
مَا وَدَّعَ	তিনি পরিত্যাগ করেননি; ছেড়ে যাননি।	وَجَدَ	তিনি পেয়েছেন
رَبُّ	প্রতিপালক, প্রভু	ضَآلًّا	পথ সম্পর্কে অনবহিত
وَمَا قَلٰى	এবং তিনি অসন্তুষ্ট হননি, বিরূপ হননি	هَدٰى	তিনি পথ প্রদর্শন করলেন
لَ	অবশ্যই	عَآئِلًا	অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব
اٰخِرَةُ	পরকাল, পরজীবন, পরবর্তী সময়	اَغْنٰى	তিনি ধনী বানালেন, তিনি অভাব দূর করলেন
خَيْرٌ	উত্তম, ভালো	لَا تَقْهَرْ	আপনি কঠোর হবেন না
لَكَ	আপনার জন্য	اَلسَّآئِلَ	প্রার্থী, ভিক্ষুক, অভাবী
مِنْ	হতে	لَا تَنْهَرْ	আপনি ধমক দেবেন না
اَلْاُوْلٰى	ইহকাল, দুনিয়ার জীবন, পূর্ববর্তী সময়	نِعْمَةِ	অবদান, ধনদৌলত, অনুগ্রহ
سَوْفَ	অচিরেই, অতি শীঘ্র	حَدِّثْ	আপনি বর্ণনা করুন, প্রচার করুন, প্রকাশ করুন, জানিয়ে দিন।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে
وَالضُّحٰى ۝	১. শপথ পূর্বাহ্নের।
وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ۝	২. শপথ রাতের, যখন তা নিঝুম হয়।
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝	৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلٰى ۝	৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝	৫. আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝	৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতিম অবস্থায় পাননি? এর পর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝	৭. এবং তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন।
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنٰى ۝	৮. এবং তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায়, এর পর তিনি অভাবমুক্ত করেন।
فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝	৯. অতএব আপনি ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হবেন না।
وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝	১০. এবং কোনো প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝	১১. আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

ব্যাখ্যা

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। তাঁরা মহান আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসুলগণের প্রতি তাঁদের জন্মলগ্ন থেকেই অবিরত ধারায় করুণা দান করে থাকেন। এ সূরায় মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি প্রদত্ত বিভিন্ন অনুগ্রহের বিবরণ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) ইয়াতিম ছিলেন। জন্মের পূর্বেই তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। আর মা মারা যান ছয় বছর বয়সে। তাকে লালন-পালন করার মতো কেউ ছিল না। মহান আল্লাহ তাকে লালন-পালনের সুব্যবস্থা করেছেন। প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ও পরে চাচা আবু তালিবের অন্তরে তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তারা নিজ সন্তানের চেয়ে বেশি যত্নসহকারে তাঁকে লালন-পালন করেছেন।

ওহি লাভের পূর্বে তিনি মহান আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। মানব জাতির দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও পরকালীন মুক্তির জন্য চিন্তাক্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সত্যের সন্ধানে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মহান আল্লাহ তখন তাঁকে নবুওয়াত দান করে সত্য ও সুন্দরের পথনির্দেশনা প্রদান করেন। হেদায়াতের আলোকবর্তিকা দান

করেন। তিনি দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত ছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে সচ্ছল ও ধনবান করেন। তাঁকে অভাবমুক্ত করেন। হযরত খাদিজা (রা) এর ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী ব্যবসা করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। পরবর্তীতে মহান আল্লাহর হুকুমে খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য উৎসর্গিত হয়। এভাবে মহান আল্লাহ পার্থিব জীবনে মহানবি (সা.)- কে বহু নিয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেন।

মহান আল্লাহ পার্থিব নিয়ামতের পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ (সা.)- কে পরকালীন বিভিন্ন নিয়ামত দান করার সুসংবাদ দান করেছেন এ সূরায়। মহান আল্লাহ মহানবি (সা.) কে সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার পরকালীন জীবন পার্থিব জীবনের তুলনায় বহুগুণ উত্তম হবে। দুনিয়াতে যত নিয়ামত দেওয়া হয়েছে আখিরাতে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রদান করা হবে।

মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পরকালে এমন কিছু দান করবেন যা পেয়ে তিনি খুশি হবেন। আর হাদিসের আলোকে জানা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ততক্ষণ পর্যন্ত খুশি হবেন না, যতক্ষণ না তাঁর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সন্তুষ্ট করবেন।

এ সূরায় মহানবি (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইহকালীন ও পরকালীন এসব অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হন। কোনো ভিক্ষুককে যেন ধমক না দেন। সর্বদা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রচার করার দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়–

১. মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনো পরিত্যাগ করেন না এবং তাদের প্রতি বিরূপও হন না।

২. বিপদ যতই কঠিন হোক না কেন তিনিই তাঁদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।

৩. তাঁদের পরকালীন জীবন পার্থিব জীবনের তুলনায় বহুগুণ উত্তম ও কল্যাণময় করে দেন।

৪. ধনী ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী ও অসহায় ব্যক্তিদের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসা।

৫. ভিক্ষুক ও সাহায্যপ্রার্থীদের ধমক বা তিরস্কার না করে যথাসম্ভব সাহায্য করা। কারণ, আল্লাহ ধনীদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অংশ রেখেছেন।

৬. ইয়াতিমদের ধমক না দিয়ে সব সময় তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে হবে।

৭. ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। যখন তিনি এ নিয়ামত কাউকে দান করেন, তখন তার উচিত কৃপণতা পরিহার করে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

একক কাজ

'সূরা আদ-দুহার শিক্ষা আমার জীবনে যেভাবে চর্চা বা অনুশীলন করব'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে সূরা আদ-দুহার শিক্ষা আমার জীবনে চর্চার কৌশল বা উপায় চিহ্নিত করে তা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো।)

সূরা আলাক (سُوْرَةُ الْعَلَقِ)

সূরা আলাক আল কুরআনের ৯৬তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ১৯টি। এ সূরার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ শব্দ আলাক থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

শানে নুযুল

নাযিলের সময়ের দিক দিয়ে এ সূরাটি দুই ভাগে বিভক্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। এটাই প্রথম ওহি। এর মাধ্যমেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবির নবুওয়াতের প্রকাশ ঘটেছে। সূরার বাকি ১৪টি আয়াত আরো পরে যখন মহানবি (সা.) কাবা শরিফে সালাত আদায় শুরু করেন এবং আবু জাহেল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন নাযিল হয়। আবু জাহেল একবার তার সঙ্গী সাথিদেরকে বলে মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে সালাত আদায় করে, সিজদা দেয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন সে বলল, লাত ও ওজ্জার শপথ, আমি যদি তাকে সালাত আদায় করতে দেখি তবে তার কাঁধে উটের নাড়িভুঁড়ি ঝুলিয়ে দেবো। সে একদিন দেখল, মহানবি (সা.) সালাত আদায় করছেন। সে অগ্রসর হলো কিন্তু পিছু হটে গেল এবং হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। তখন তাকে বলা হলো, তোমার কী হলো? সে বলল, নিশ্চয়ই তার মাঝে আর আমার মাঝে একটি আগুনের পরিখা দেখলাম, যা অত্যন্ত ভয়াবহ ও ডানাসমৃদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে শেষের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اِقْرَاْ	পাঠ করুন, পড়ুন	اَلْهُدٰى	সৎপথ, সঠিক পথ
بِاسْمِ	নামে	اَوْ	অথবা
رَبِّكَ	আপনার প্রতিপালক	اَمَرَ	সে আদেশ করে

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلَّذِيْ	যিনি	التَّقْوٰى	আল্লাহর ভয়
خَلَقَ	সৃষ্টি করেছেন	كَذَّبَ	সে মিথ্যারোপ করে
اَلْاِنْسَانَ	মানুষ	تَوَلّٰى	সে মুখ ফিরিয়ে নেয়
مِنْ	হতে	يَرٰى	তিনি দেখেন
عَلَقٍ	লেগে থাকা রক্ত	كَلَّا	সাবধান, কখনো না
اَلْاَكْرَمُ	মহামহিমান্বিত, সর্বাধিক সম্মানিত	لَّمْ يَنْتَهِ	সে বিরত থাকে না।
عَلَّمَ	তিনি শিক্ষা দিয়েছেন	لَنَسْفَعًا	অবশ্যই হেঁচড়ানো হবে
بِالْقَلَمِ	কলমের সাহায্যে	اَلنَّاصِيَةِ	মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ
لَمْ يَعْلَمْ	সে জানত না	كَاذِبَةٍ	মিথ্যাচারী
اَرَاَيْتَ	তুমি কি তাকে দেখেছ?	خَاطِئَةٍ	পাপিষ্ঠ
يَنْهٰى	সে বাধা দেয়	فَلْيَدْعُ	সে যেন আহ্বান করে
عَبْدًا	বান্দা, গোলাম	نَادِيَ	পার্শ্বচর
اِذَا	যখন	اَلزَّبَانِيَةَ	জাহান্নামের প্রহরী
صَلّٰى	সে সালাত আদায় করে	اُسْجُدْ	আপনি সিজদা করুন
اِنْ	যদি	اِقْتَرِبْ	আপনি নিকটবর্তী হন

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ	১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ	২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে।
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ	৩. পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।
الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ	৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ	৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।
كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ	৬. বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে।
اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۗ	৭. কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।
اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۗ	৮. আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۙ	৯. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বাধা দেয়?
عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۗ	১০. এমন বান্দাকে- যখন সে সালাত আদায় করে?
اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ	১১. আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে সৎ পথে থাকে
اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۗ	১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়।

أَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝	১৩. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়,
أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝	১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন
كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا ۢ بِالنَّاصِيَةِ ۝	১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে–
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝	১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।
فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝	১৭. অতএব সে তার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক।
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝	১৮. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদের।
كَلَّا ۗ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝	১৯. সাবধান! আপনি এর অনুসরণ করবেন না এবং সিজদা করুন ও আমার নিকটবর্তী হন।

ব্যাখ্যা

সূরা আলাকের পূর্বের সূরা তীনে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন যে, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। সূরা আলাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক তথা লেগে থাকা জমাট বাধা রক্ত থেকে।

প্রকাশ্যভাবেই এ দুইয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। প্রথম আয়াতটি বাহ্যিক গঠন ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে। আর দ্বিতীয় আয়াতটি মৌলিক সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করে। এই সূরার শুরুতে পড়া ও শিক্ষাদানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাযিলকৃত অনন্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ আল কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জীবনে প্রাচুর্য ও শক্তিমত্তার জন্য অবাধ্যাচরণ এবং এ নিয়ামত পেয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আবু জাহেলের পাপাচার উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রিয়নবি (সা.)- কে সালাত আদায়ে বাধা দিত। সালাতরত অবস্থায় উটের নাড়িভুঁড়ি কাঁধে পেঁচিয়ে দিত। এরপর এরকম পাপিষ্ঠ কাফিরদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যদি তারা এহেন কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং ভয়ানক শাস্তি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সর্বশেষে, বেশি বেশি সিজদা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদিসে এসেছে– বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন তার প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়।

সূরা আলাকের শেষ আয়াত সিজদার আয়াত। এ আয়াত যে পাঠ করে এবং শোনে, সবার ওপর তিলাওয়াতের সিজদা করা ওয়াজিব।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়-

১. আল্লাহ তা'আলা মহানবি (সা.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে।

৪. আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে বাধা প্রদান করলে তার পরিণতি ভয়াবহ।

৫. আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করেছেন।

৬. বেশি বেশি সিজদা করলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

সূরা আলাকের শিক্ষা তোমার বাস্তব জীবনে চর্চা বা অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলোর তালিকা প্রস্তুত করো।

সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত

কুরআন মাজিদের প্রতিটি সূরা ও আয়াত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদাবান। তবে বিশেষ কিছু আয়াত ও সূরা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তার মধ্যে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অন্যতম। সূরা আল-হাশর পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সূরা। এটি মদিনায় নাজিল হয়। আমরা এখন সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ ২২, ২৩ ও ২৪তম আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা, ফযিলত সম্পর্কে জানব।

ফযিলত

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের অনেক গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে। এ আয়াতগুলোর মধ্যে মহান আল্লাহর কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ গুণবাচক নামের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ তিন আয়াতের ফযিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিন বার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম।) পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। আর এ সময়ের মাঝে যদি লোকটি মারা যায়, তাহলে সে শহিদের মৃত্যু লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই ফযিলত লাভ করবে। (তিরমিযি)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
هُوَ	সে, তিনি	اَلْعَزِيْزُ	পরাক্রমশালী
اَلَّذِىْ	যে, যিনি	اَلْجَبَّارُ	প্রবল
عٰلِمُ	জ্ঞানী	اَلْمُتَكَبِّرُ	অতিমহিমান্বিত
اَلْغَيْبِ	অদৃশ্য	سُبْحٰنَ	পবিত্র, মহান
اَلشَّهَادَةِ	দৃশ্যমান, উপস্থিত	يُشْرِكُوْنَ	তারা শিরক করে, অংশীদার স্থাপন করে
اَلرَّحْمٰنُ	দয়াময়	اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা
اَلرَّحِيْمُ	পরম দয়ালু	اَلْبَارِئُ	উদ্ভাবনকারী
اَلْمَلِكُ	অধিপতি, মালিক	اَلْمُصَوِّرُ	রূপকার, রূপদাতা
اَلْقُدُّوْسُ	পবিত্র	اَلْاَسْمَآءُ	নামসমূহ
اَلسَّلٰمُ	শান্তি	اَلْحُسْنٰى	সুন্দর
اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তাদানকারী	يُسَبِّحُ	সে তাসবিহ পড়ে, মহিমা ঘোষণা করে
اَلْمُهَيْمِنُ	রক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী	اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়, প্রজ্ঞাবান

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج	১. তিনিই আল্লাহ,তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ	২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত।
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ	৩. তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ	৪. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।
اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ	৫. তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি।
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ	৬. তিনিই নিরাপত্তাদানকারী, তিনিই রক্ষক।
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط	৭. তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○	৮. তারা যা কিছু শরিক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান।
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ	৯. তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা।
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	১০. উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদাতা
لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط	১১. তাঁর রয়েছে উত্তম নামসমূহ।
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج	১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○	১৩. তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা

এ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহর কিছু গুণবাচক নামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত গুণবাচক নামে মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের বহিঃপ্রকাশ করা হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই। সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তা জানেন। আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা, তিনি তা-ও জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোনো বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তাঁর রহমত অসীম ও অফুরন্ত, সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আসমান-জমিন থেকে শুরু করে সৃষ্টির সকল কিছু তার নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন, যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়। ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। আসমান-জমিনের সবই তাঁরই তাসবিহ পড়ে ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল-হাদিস

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে হাদিস সর্ম্পকে জেনেছ। তোমরা সেখানে হাদিসের পরিচয়, প্রকারভেদ, গুরুত্ব ও বিশুদ্ধ ৬টি হাদিসগ্রন্থ সম্পর্কে জেনেছ। মানবিকতা ও নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কিত এবং মুনাজাতমূলক জীবনঘনিষ্ঠ নির্বাচিত কিছু হাদিস শিখেছ। তোমরা সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে হাদিস সম্পর্কে যা শিখেছ, নবম শ্রেণিতে তার সঙ্গে হাদিস, সুন্নাহ, আসার, হাদিসে কুদসি, মাতরুক, মাওযু হাদিসের পরিচয় ও হাদিসের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে। পাশাপাশি নির্বাচিত কিছু হাদিসের শিক্ষা এবং মুনাজাতমূলক জীবনঘনিষ্ঠ হাদিস শিখে বাস্তব আমল করতে পারবে।

হাদিস

হাদিস (حَدِيْث) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো কথা, বক্তৃতা, বাণী, বার্তা, সংবাদ, বিষয় ও খবর ইত্যাদি। সাধারণত রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর কথা, কাজ, অনুমোদন ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে। নবি করিম (সা.) যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন, অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদিস বলা হয়।

সুন্নাহ (اَلسُّنَّة)

সুন্নাহ শব্দটি হাদিসের সমার্থক শব্দ। সুন্নাহ শব্দের অর্থ পথ, পদ্ধতি, কর্মের নীতি ও আদর্শ। রাসুলুল্লাহ (সা.) যে পথ, পন্থা ও রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করে চলতেন, তাকে সুন্নাহ বলা হয়। অন্য কথায় রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রচারিত আদর্শই সুন্নাহ। কুরআন মাজিদে উত্তম আদর্শ বলতে এই সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে।

আসার (آثَار)

আসার শব্দটির অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন ও বস্তুর অবশিষ্ট অংশ। আসার শব্দটিও কখনো কখনো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসকে নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদিস ও আসার এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে- সাহাবিগণ থেকে শরি'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আসার বলে। কারো কারো মতে, সাহাবি ও তাবেয়িগণের কথা ও কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনই হলো আসার।

হাদিসে কুদসি: যে হাদিসের মূল বক্তব্য আল্লাহ তা'আলা সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদিসে কুদসি বলে। মাতরুক (مَتْرُوْكٌ) : মাতরুক শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য ও বাতিল। যে রাবি সকল মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল, তার বর্ণিত হাদিসকে মাতরুক বলে। অন্য কথায় যে হাদিস কোনো দুর্বল রাবি একা বর্ণনা করেছেন তাই 'মাতরুক' বা পরিত্যক্ত। তার হাদিস 'মারদুদ' বা প্রত্যাখ্যাত।

মাওযু (مَوْضُوْعٌ) বা জাল হাদিস: মাওযু শব্দের অর্থ জাল, মনগড়া, বানোয়াট, তৈরিকৃত, নির্মিত, মিথ্যা কথা রটনা এবং ভুলভাবে মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী বর্ণনা করা ইত্যাদি। মহানবি (সা.)-এর উপর বানোয়াট ও রচনাকৃত কথাকেই মাওযু হাদিস বলে। অন্য কথায় যে হাদিসের রাবি জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছেন বলে প্রমাণিত, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওযু হাদিস বলে। মোটকথা মহানবি (সা.) এর নামে অসত্যভাবে যে কথা বলা হয়েছে, তা-ই জাল হাদিস।

মাওযু বা জাল হাদিসের হুকুম: জাল হাদিস যেহেতু হাদিস নয়, তাই জাল ও বানোয়াট জানার পরও উক্ত বক্তব্যটিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর হাদিস বলে প্রচার করা হারাম। তবে মানুষকে জাল হাদিস চেনানোর জন্য তা বর্ণনা করা জায়েয।

হাদিসের গুরুত্ব

হাদিস মুসলমানদের এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিস। ইসলামি জীবন বিধানের অন্যতম মূলভিত্তি। কুরআন মাজিদের পরই হাদিসের স্থান। কুরআন মাজিদ যেখানে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি পেশ করে, হাদিস সেখানে এ মূলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে। কুরআন ইসলামের আলোকস্তম্ভ, হাদিস তাঁর বিচ্ছুরিত আলো। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ওহি। হাদিস অপ্রকাশ্য ওহি। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে কখনও মনগড়া কথা বলেননি। মহান আল্লাহর নির্দেশনা পেয়েই তিনি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে জানাতেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۞

অর্থ: এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

হাদিসে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, আদর্শ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর ভয়, সত্যের পথে আপসহীনতা, বিশ্বস্ততা, সততা, নবুওয়াত, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়।

আল কুরআনে 'সব কিছুর' বর্ণনা রয়েছে। সেগুলোর অধিকাংশই 'প্রাথমিক নির্দেশ'। ব্যাখ্যা ছাড়া যেগুলো পালন করা অসম্ভব। মহানবি (সা.) সংক্ষিপ্ত নির্দেশগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন: ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত 'সালাত'। কুরআনের অনেক স্থানে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআনে সালাতের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়নি। অর্থাৎ 'সালাত' কী, কখন তা আদায় করতে হবে, কখন কত রাকআত আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাকআত কী পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাকআতে কুরআন পাঠ কীভাবে হবে, রুকু কয়টি হবে, সিজদা কয়টি হবে, কীভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করতে হবে। কোনো কিছুই কুরআনে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাতের বিস্তারিত পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ
فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

অর্থ: তোমরা সালাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। সালাতের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দেবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের সালাতের ইমামতি করবে। (বুখারি)

অনুরূপভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু যাকাত প্রদানের বিস্তারিত নির্দেশনা কুরআনে নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) এগুলোর নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে হাদিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই কুরআনের মতো হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। মোটকথা একজন মুসলমানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশনা আমরা রাসুলের হাদিসে পেয়ে থাকি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ: রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। (সূরা হাশর, আয়াত : ৭)

আল্লাহর ক্ষমা ও ভালোবাসা লাভের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা একান্ত জরুরি। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের

অপরাধ ক্ষমা করবেন'। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) মানব জাতির শিক্ষক ছিলেন। আমরা হাদিসের মাধ্যমে মহানবি (সা.)-এর জীবনাদর্শ জানতে পারি। তিনি কেমন ছিলেন, কীভাবে কুরআন লাভ করলেন, কীভাবে তা শিক্ষা দিলেন, কীভাবে সংকলন করলেন ইত্যাদি।

অতএব মানব জীবনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হাদিস ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কুরআন বোঝা বা ইসলামি জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। আবার হাদিসকে অস্বীকার করা কিংবা সন্দেহ পোষণ করা কুফরি। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুবহু অনুকরণ করব। হাদিসের ভিত্তিতেই কুরআনের নির্দেশাবলি পালন করব। আর হাদিসের আলোকে জীবন গঠন করব।

মহানবি (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদিস

হাদিস- ১ : (সন্তানকে সালাতের নির্দেশ সম্পর্কিত হাদিস)

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ

অর্থ: তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরে পৌঁছে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে সন্তানকে দ্বীন শিখানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিশুর জীবনের গতিপথ নির্ধারণে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তানকে আখিরাতের প্রস্তুতির শিক্ষা দেওয়া মাতাপিতার ওপর কর্তব্য। তাকে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষা দিতে হবে। আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া তাকে যদি ভালো কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি তাকে মন্দ কাজে অভ্যস্ত করা হয়। অথবা অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়। তাহলে সে হতভাগ্য ও ধ্বংস হবে।

ইমানের পর সালাতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো শৈশব থেকে সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করা। তাহলে সে ভবিষ্যতে সালাতের প্রতি যত্নবান হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাতকে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী আখ্যা দিয়েছেন। শুধু সালাত আদায় নয়, বরং পরিবার ও সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশও দিয়েছে ইসলাম।

মা-বাবা ও অভিভাবককেও সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ, শিশুরা বড়দের দেখে শেখে। মা-বাবা সালাত আদায়ের সময় সন্তানকে পাশে রাখবে। যেন সন্তান তাদের অনুকরণ করতে পারে। শুধু উপদেশ বা ধারণা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। মোটামুটি বুঝ-জ্ঞান হলে সন্তানকে মসজিদে নিতে হবে। সাত বছর বয়স হলে সন্তানকে হাতে-কলমে সালাত শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানের সামনে সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। সালাত

না পড়ার কুফল ও শাস্তি বর্ণনা করতে হবে। সালাত সম্পর্কিত ঘটনা শোনাতে হবে। তাহলে শিশুরা সালাতে উৎসাহী হবে।

সন্তান ঠিকমতো সালাত পড়ছে কি না, সেদিকেও মা-বাবাকে লক্ষ রাখতে হবে। সালাতে অলসতা করলে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। সন্তান যেন সালাতের প্রতি যত্নবান হয়, সেজন্য মা-বাবা দোয়াও করবে। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে উৎসাহের মাধ্যমে সালাতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করবে। ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সন্তানকে সালাতের নির্দেশ দেবে। এরপরও তারা সালাতে অবহেলা করলে প্রয়োজনে শাসন করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্তানদের নেককার ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন।

শিক্ষা

১. মাতা-পিতার দায়িত্ব হলো সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষাসহ আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।

২. মাতা-পিতা নিজে সালাতের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া।

৩. সন্তানকে ৭ বছর থেকে সালাতে অভ্যস্ত করা। শিশুকাল থেকে সালাতে অভ্যস্ত না হলে পরে সালাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৪. ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও সালাতে অবহেলা করলে শাসন করা।

হাদিস-২ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ

أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

অর্থ: কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে মানুষ অথবা পাখি অথবা চতুষ্পদ প্রাণি খায়, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হিসেবে গণ্য হবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণ ও ফসল উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মানুষের জীবনযাত্রায় সবুজ বৃক্ষ ও ফসলের অবদান অপরিসীম। এর দ্বারা মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি লাভ করি। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষের ভূমিকা

গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য।

আবার বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। খাদ্য থেকে শুরু করে ওষুধ পর্যন্ত সবকিছুই মানুষ বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন করে। মানুষ এসব করে নিজ প্রয়োজনে, নিজের জন্য। বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদের মাধ্যমে মানুষ যে সৃষ্টির সেরা, তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

আমরা অনেকেই কৃষিকাজকে তুচ্ছ মনে করি। ছোট বলে ঘৃণা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজই ছোট নয়। সৎভাবে করা সকল কাজই উত্তম। বৃক্ষরোপণেও কোনো লজ্জা নেই; বরং এটি অনেক সাওয়াবের কাজ।

বৃক্ষরোপণ বা ফসল ফলানো এমন একটি কাজ যা দ্বারা শুধু মানুষই নয় পশুপাখি এবং অন্যান্য প্রাণিও উপকৃত হয়। এ জন্য মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে সাদকাহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

শিক্ষা

১. মহানবি (সা.) আমাদেরকে বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

২. সৃষ্ট জীবের উপকারের প্রত্যাশায় বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদ করা সাদকায়ে জারিয়া। যতদিন এগুলো বেঁচে থাকবে, ততদিন ব্যক্তির আমলনামায় সাওয়াব লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

৩. বৃক্ষরোপণ দ্বারা মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি আখিরাতেও প্রতিদান পাওয়া যায়। এ জন্য প্রত্যেকের উচিত বীজ বপন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিচর্যা করা।

৪. বৃক্ষরোপণ ও চাষাবাদ করা নবির সুন্নাত।

৫. মানুষের উৎপাদিত ফল-ফসলে পশু-পাখি এবং অন্যদেরও অধিকার রয়েছে।

৬. পরিবেশ ও মানুষের জন্য ঔষধি বৃক্ষ বা ফলবান বৃক্ষ খুবই উপকারি।

৭. মু'মিনের কোনো তৎপরতাই বৃথা যায় না।

৮. অপরের উপকার করাই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

হাদিস-৩: (কাজের শুরুতে সংকল্প বা নিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদিস)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ: প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারি)

ব্যাখ্যা

এই হাদিসটি সহিহ বুখারির সর্বপ্রথম হাদিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যা করে, সব কিছুই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এ হাদিস দ্বারা কাজের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। নিয়ত আরবি শব্দ। নিয়ত হচ্ছে মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা বা সংকল্প। শরি'আতের পরিভাষায় খাঁটি নিয়ত হলো একনিষ্ঠতার সঙ্গে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা।

ইসলামে বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব অনেক বেশি। সালাত, সাওম থেকে শুরু করে সবকিছুতেই নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি। নিয়তের বিশুদ্ধতা না থাকলে ভালো কাজও মূল্যহীন। আল্লাহর কাছে সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে না। নিয়তে গরমিল থাকার কারণে ভালো কাজ করেও জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব হবে। সেদিন কে কোন নিয়তে কাজ করেছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। মানুষ সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করলে পুরস্কার পাবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও পুরস্কার পাবে। আর মন্দ উদ্দেশ্যে কাজ করলে শাস্তি পাবে। যেমন যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সমাজসেবা করে, তাদের সমাজসেবাও হবে, আবার তারা আল্লাহর নিকট প্রতিদানও পাবে। আবার যারা লোক দেখানোর নিয়তে সমাজসেবা করে, তাদের শুধু সমাজসেবাই হবে। তারা আল্লাহর নিকট কোনো প্রতিদান পাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের চেহারার দিকে না তাকিয়ে অন্তর দেখবেন। নিয়ত সঠিক না হলে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হবে। লোক দেখানো কাজকে ইসলামের পরিভাষায় রিয়া বলে। রিয়া সম্পর্কে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। আর তা হলো– উম্মে কায়স নামের একজন নারী ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বিয়ে করার জন্য মদিনায় হিজরত করে। ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। যার মূল বক্তব্য হলো– আল্লাহ তা'আলার সন্তষ্টির জন্য হিজরত করা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। আল্লাহর সন্তষ্টির নিয়ত না থাকায় লোকটি হিজরতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো।

সুতরাং আমরা বিশুদ্ধ নিয়তে সকল কাজ করব। লোক দেখানো বা দুনিয়াবি লাভের আশায় কোনো কাজ করব না; বরং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের সন্তষ্টির জন্য কাজ করব।

শিক্ষা

১. আমাদের প্রতিটি কাজে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

২. কর্মফল নিয়তের উপরই নির্ভশীল। নিয়ত ভালো হলে উত্তম প্রতিদান পাবে। আর নিয়ত খারাপ হলে ভালো কাজ করেও সাওয়াব পাবে না।

৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষের বাহ্যিক আমলের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন।

৪. প্রচারণামূলক লোক দেখানো ইবাদাত বা কাজ পরিহার করা উচিত।

৫. মৃত্যুর পর সব কাজেরই হিসাব হবে।

৬. নিয়ত খারাপ হলে ভালো কাজ করেও পরকালে শাস্তি পেতে হবে।

হাদিস- ৪ (রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসা সম্পর্কিত হাদিস

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থ: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হব। (বুখারি)

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকৃত মু'মিন হওয়ার শর্ত। নবি (সা.)- এর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ছাড়া তাঁর আদর্শ সমাজে বাস্তবায়ন অসম্ভব।

ইমানের দাবি হলো, সর্বক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতকেই প্রাধান্য দেওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণে নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দেওয়া। এভাবে নবি (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

অতএব মু'মিনদেরকে সকল ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে। বলতে হবে আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা এবং আনুগত্য।

শিক্ষা

১. প্রকৃত ইমানের দাবি হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন সম্ভব নয়।

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা হলো সমাজ জীবনে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

৫. মহানবি (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা হবে আকিদা, বিশ্বাস, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকজনিত।

৬. ইসলামি আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী সকল প্রিয়জনকে উপেক্ষা করে মহানবি (সা.)-কে ভালোবাসতে হবে।

হাদিস- ৫ (মু'মিনের ওপর অপর মু'মিনের দায়িত্ব সম্পর্কিত হাদিস)

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهٗ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهٗ
إِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهٗ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهٗ وَيُشَمِّتُهٗ
إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهٗ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ

অর্থ: এক মু'মিনের ওপর আরেক মু'মিনের ছয়টি হক রয়েছে। সে অসুস্থ হলে তাকে সেবা করবে, মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে, তাকে ডাক দিলে সে সাড়া দেবে, তার সঙ্গে দেখা হলে তাকে সালাম দেবে, সে হাঁচি দিলে তার জবাব দেবে এবং তার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সব সময় তার কল্যাণ কামনা করবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা

ইসলামে রয়েছে অধিকার ও কর্তব্যের সুন্দর সমন্বয়। সবাইকে দেওয়া হয়েছে তার প্রাপ্য অধিকার। ইসলামে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অন্যের হকের ওপর। আর মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। এক মুসলমান ভাইয়ের ওপর অন্য মুসলমান ভাইয়ের ছয়টি হক রয়েছে। হকগুলো হলো:

একজন মু'মিন অসুস্থ হলে তার খোঁজখবর নেওয়া, সেবা-শুশ্রূষা করা, তাকে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সহযোগিতা করা, তার সুস্থতার জন্য দোয়া করা ইত্যাদি অন্য মু'মিনের নৈতিক দায়িত্ব। এটি আত্মীয়, অনাত্মীয়, ধনী-গরিব, পরিচিত-অপরিচিত সকল মু'মিনের জন্য। কেননা, রোগীর সেবা করার মাঝেই আল্লাহর সেবা নিহিত।

এছাড়া কোনো মু'মিন মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এটা শুধু নৈতিক দায়িত্বই নয়; বরং তা ঈমানের অঙ্গও বটে। জানাযায় অংশগ্রহণ ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ কাজ।

মু'মিনের ডাকে যথাসাধ্য সাড়া দিতে হবে। বিশেষ করে একজন মু'মিন যখন কোনো ভালো কাজে ডাকবে, অথবা কোনো বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ডাকবে, অথবা খাওয়ানোর জন্য ডাকবে, তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া অন্য মু'মিনের কর্তব্য।

ইসলামে আদব বা সামাজিক শিষ্টাচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম হলো সালাম বিনিময় করা। সালাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সম্ভাষণ। তিনি জান্নাতিদের লক্ষ করে সালাম দেবেন। সালাম অত্যন্ত সহজ ও অন্যের জন্য কল্যাণ কামনামূলক একটি সম্ভাষণ। কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে, মজলিসে আগমন করলে উপস্থিত লোকদের, ছোট-বড়, ধনী-গরিব সবাইকে সালাম দিতে হবে। তাছাড়া যে আগে সালাম দেবে সেই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

কোনো মু'মিন যদি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বলে, তাহলে শ্রোতা তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ করুক) বলবে। এ উত্তর শোনার পর হাঁচি দাতা 'ইয়াহদিকুমুল্লাহু'

(আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন) বলবে। হাঁচিদাতা হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দেওয়া লাগবে না। হাঁচির আদব হলো, হাঁচি দেওয়ার সময় হাত অথবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা এবং যথাসম্ভব শব্দ কম করা।

মু'মিনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করতে হবে। অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনার অর্থ হলো, তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ নষ্ট না করা এবং নষ্ট হতে দেখলে তা হেফাজত করা। উপস্থিতিতে কল্যাণ কামনার অর্থ হলো, তাকে সর্বাবস্থায় সহযোগিতা করা, তার প্রতি যুলুম না করা, তাকে যুলুম করতে না দেওয়া, তাকে ধোঁকা না দেওয়া, ধোঁকায় পড়ার আশংকা থাকলে তাকে সচেতন করা, তার সঙ্গে বিভেদ না করা ইত্যাদি।

এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের আরো কিছু দায়িত্ব হলো, তাকে সাহায্য করা, তার দোষ গোপন রাখা, তার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা, তার সম্পর্কে মনে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ পুষে না রাখা ইত্যাদি।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে বিষয়গুলো লক্ষ রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে অপর মুসলিম ভাইয়ের হকগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন।

শিক্ষা

১. অসুস্থতার সময় একজন মু'মিন অপর মু'মিনের পাশে থেকে সেবা ও সহায়তা করবে।
২. মু'মিনের জানাযায় অংশগ্রহণ করবে। তার পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দেবে। তার দাফনের কাজ শেষ করবে।
৩. বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় তার দাওয়াতে সাড়া দেবে।
৪. পরিচিত অপরিচিত সকল মু'মিনের মাঝে সালামের প্রচলন করবে।
৫. হাঁচি দেওয়ার পর তার জন্য দোয়া করবে।
৬. মু'মিনের ক্ষতি হয় এমন কাজ করবে না; বরং সার্বিকভাবে তার কল্যাণ কামনা করবে।

হাদিস-৬ (মৃত্যু পরবর্তী আমল সম্পর্কিত হাদিস)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

অর্থ: যখন কোনো লোক মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিন প্রকার আমল ব্যতীত। সাদকাহ জারিয়া (চলমান দান); ঐ ইলম, যা দ্বারা অন্য লোক উপকৃত হয়; আর নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

পৃথিবীতে মানুষের সব কর্মতৎপরতা সংরক্ষণ করা হয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এসব কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তিনটি আমল কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রিয় নবি (সা.) আলোচ্য হাদিসে এ তিনটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। আমল তিনটি হলো:

এমন দান, যাতে মানুষ ও প্রাণিজগৎ সর্বদা উপকৃত হয়। এ দানের সাওয়াব চলমান। যেমন: মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, সরাইখানা, হাসপাতাল, পুল নির্মাণ, গাছ লাগানো, দীর্ঘস্থায়ী অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ ইত্যাদি।

এমন জ্ঞান, যাতে মানুষ উপকৃত হয়। যেমন: ইসলামি ও জনকল্যাণমূলক বই-পুস্তক রচনা করা, জনকল্যাণমুখী আবিষ্কার, আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ ছাত্র তৈরি করে যাওয়া, যারা অন্যদের জ্ঞান বিতরণ করতে থাকবে, এমন আদর্শ রেখে যাওয়া যা চিরকাল মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকবে ইত্যাদি।

অনুরূপ সুশিক্ষিত ও আদর্শ সন্তান রেখে গেলে সন্তানের সৎকর্ম দ্বারা মাতা-পিতা উপকৃত হতে থাকবে। সন্তান যত দিন নেক কাজ করবে, মাতা-পিতা ততদিন তা থেকে সাওয়াব পেতে থাকবে। সন্তান মাতা-পিতার জন্য দোয়া করতে থাকবে। নেক সন্তান বলবে, হে আল্লাহ মাতা-পিতা আমার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, আমার শৈশবকালে আদর-যত্ন দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন, তুমি তাঁদের প্রতি অনুরূপ দয়া ও অনুগ্রহ করো।

অতএব যারা চলমান জনকল্যাণমূলক কাজ করবে, উপকারী জ্ঞান ও নেক সন্তান রেখে যাবে, তারা মৃত্যুর পরও সাওয়াব পেতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ ধরনের কাজ করার তাওফিক দান করুন।

শিক্ষা

১. মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান ও নেক সন্তান মানুষের জন্য সাওয়াব পাঠাতে পারে।

২. সাধারণ দানের পাশাপাশি সাদকায়ে জারিয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কল্যাণমূলক কাজ হলো সর্বোত্তম ইবাদাত।

৩. আমাদের যথাসম্ভব স্থায়ী কল্যাণমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে অর্থ ও মেধা ব্যয় করা উচিত। তাহলে মৃত্যুর পরও ভালো কাজে অংশগ্রহণের ধারা অব্যাহত থাকবে।

৪. মাতা-পিতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে সৎ ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সন্তানের কর্তব্য হলো মাতা-পিতার আনুগত্য করা। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা।

৫. মু'মিনের সকল কাজের মূল লক্ষ্য হবে আখিরাতের সফলতা।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'কুরআন-হাদিসের যে শিক্ষায় আমার জীবন আলোকিত করব'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা তোমার বাস্তব জীবন কীভাবে আলোকিত বা উদ্ভাসিত করবে ৩০০ শব্দের মধ্যে লিখে আনবে।)

মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস

বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তিনি আমাদের প্রতিপালক। পরম দয়ালু ও দাতা। তাঁর নিকট রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাইব। আমরা ডাকলে তিনি সাড়া দিবেন।রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে আল্লাহর নিকট চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। মহানবি (সা.)-এর বহু মুনাজাতমূলক হাদিস রয়েছে। আমরা এখানে মোনাজাতমূলক দুটি হাদিস শিখব।

হাদিস– ১

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়া।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট গর্হিত চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কুপ্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাই। (তিরমিযি)

হাদিস– ২

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্‌আলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদা-দা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত ও সরলপথ প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

উপরিউক্ত হাদিস দুটি গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাতমূলক হাদিস। প্রথম হাদিসে গর্হিত চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কুপ্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হাদিসে হেদায়াত ও সরলপথ প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রার্থনা শিখানো হয়েছে। আমরা অর্থসহ হাদিস দুটি শিখব। হাদিস দুটির মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করবেন।

শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের আসর

এ অধ্যায়ের পূর্ববর্তী সেশনগুলোর আলোকে তোমরা শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করো।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরার সময় অনেক কাজ করো। তাই না? কিন্তু তুমি যে কাজগুলো করো তার সবগুলো কি সঠিক বা ইসলামসম্মত? আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে আখলাকের গুরুত্ব এবং কতিপয় ভালো ও মন্দ চরিত্র সম্পর্কে জানব। আখলাক শব্দটি আরবি 'খুলুকুন' শব্দের বহুবচন। খুলুকুন এর আভিধানিক অর্থ স্বভাব, চরিত্র, আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি। আখলাক বলতে ভালো স্বভাব আর খারাপ স্বভাব উভয়কেই বোঝায়। আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূপ। পরিভাষায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালো বা মন্দ সকল আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা এবং কর্মপন্থাকে একত্রে চরিত্র বা আখলাক বলা হয়। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়। তাহলে চলো, আখলাক সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

আখলাকের গুরুত্ব

আখলাক মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতির চরিত্র যত উন্নত, সে জাতি তত সমৃদ্ধ। চরিত্রহীন জাতির দ্বারা শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করে। নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ: উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। (বায়হাকি)

উত্তম চরিত্রই উন্নত জাতির জীবনীশক্তি। ইহ ও পরকালীন সুখ-শান্তি উত্তম আখলাকের ওপরই নির্ভরশীল। চরিত্রবান ব্যক্তি যেমন সমাজের চোখে ভালো, তেমনি মহান আল্লাহর নিকটও প্রিয়। মহানবি (সা.) বলেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই লোকই অধিক প্রিয়, যার চরিত্র উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

উত্তম চরিত্র মানুষকে তাকওয়া অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। আর চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা-সম্মান ও বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে। তাঁর বিপদে-আপদে সবাই এগিয়ে আসে। তিনি সমাজে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। অপরদিকে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা ও নিন্দা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না, এড়িয়ে চলে। তার বিপদাপদেও কেউ তাকে সাহায্য করে না। যার চরিত্র যত উন্নত আমলের দিক থেকেও সে তত অগ্রসর। নবি করিম (সা.) বলেন,

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ: উত্তম চরিত্রই নেক কাজ। (মুসলিম)

উত্তম চরিত্র মু'মিন জীবনের ভূষণ। চরিত্রবলেই মানুষ সর্বত্র সমাদৃত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে যেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি মানবজাতিকে সচ্চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হওয়ার জন্য তিনি সৎ ও নৈতিক স্বভাব অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। উন্নত চরিত্র মানুষকে ইমানের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। মহানবি (সা.) বলেন, 'মু'মিনগণের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের বিচারে সবচেয়ে উত্তম।' (তিরমিযি) প্রকৃতপক্ষে উত্তম চরিত্র পরকালীন জীবনেও মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার ও মুক্তির উপায় হবে।

আর চরিত্রহীন ব্যক্তি সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে। সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেবেন। মহানবি (সা.) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ

অর্থ: দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পরকালে অত্যধিক মর্যাদা লাভ করবে। উত্তম চরিত্র মিযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী হবে। উন্নত চরিত্র মানুষকে ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে। আর ভালো কাজ মানুষের পাপকে মুছে দেয়। নবি করিম (সা.) বলেন, 'উত্তম চরিত্র পাপকে এমনভাবে বিগলিত করে যেমনভাবে সূর্যতাপ বরফকে বিগলিত করে।' (বায়হাকি)

আমরা উত্তম চরিত্র অর্জন করব। নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করব। যাতে সত্যিকার মানুষ হিসেবে সকলের

প্রিয়পাত্র হতে পারি। আর পরকালে আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে পারি।

একক কাজ

'পূর্বের শ্রেণিতে (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) জানা বা শেখা আখলাক যেভাবে চর্চা এবং বর্জন করি'

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি পূরণ করে অভিভাবকের মতামত বা স্বাক্ষরসহ জমা দিবে)।

ক্রমিক	উত্তম বা মন্দ আখলাক	যেভাবে চর্চা/বর্জন করেছি	অভিভাবকের মন্তব্য (হ্যাঁ/না)
১.	বিনয়	বিদ্যালয়, পরিবারে কথা বলার সময় ছোট/বড় সবার সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করি।	হ্যাঁ
২.	পরোপকার		
৩.	গুজব বা অপপ্রচার		
৪.	প্রতিবেশির সেবা		
৫.	বড়দের সম্মান		

আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র)

'হামিদাহ' শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়। আখলাকে হামিদাহ হলো মানুষের প্রশংসনীয় চরিত্র, সুন্দর চরিত্র, উত্তম গুণাবলি, সচ্চরিত্র ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র আল্লাহ তা'আলা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পছন্দনীয় ও সমাদৃত তাকে 'আখলাকে হামিদাহ' বলা হয়।

এককথায়, মানব চরিত্রের উত্তম, সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। যেমন, ধৈর্য্য, সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, মানব সেবা, দেশপ্রেম, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি।

আমরা তাওয়াক্কুল, শ্রমের মর্যাদা, সৌহার্দ্য ও সাম্য, শিশুদের প্রতি সদাচার, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা ও অধিকার, হালাল উপার্জন ও সমাজসেবা প্রভৃতি প্রশংসনীয় গুণাবলি সম্পর্কে জানব।

তাওয়াক্কুল

'তাওয়াক্কুল' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভরসা করা, নির্ভর করা, আস্থা রাখা ইত্যাদি। পরিভাষায়, যেকোনো প্রয়োজন কিংবা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভর করাকেই তাওয়াক্কুল বলে। অন্যকথায় তাওয়াক্কুল হলো, কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখা।

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও ফযিলত

ইসলামে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিমাণ যার যত বেশি, তার সফলতাও তত বেশি। কারণ সফলতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তাওয়াক্কুলের গুণ অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা মু'মিনের একটি অপরিহার্য গুণ। আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে ইমান বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাস মজবুত হয়। এটি ইমানের শর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

অর্থ: আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহর ওপর নির্ভর করুক। (সূরা আত তাবাগুন, আয়াত: ১৩)

অন্য আয়াতে এসেছে, وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ: আর আল্লাহর ওপর তোমরা নির্ভর করো, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ২৩)

তাওয়াক্কুলের ফল অতি উত্তম। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলে মন শান্ত থাকে। মনে প্রশান্তি আসে। কেননা আল্লাহ তো রাজাধিরাজ। তিনি চিরঞ্জীব ও মহাপরাক্রমশালী। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○

অর্থ: আর তুমি নির্ভর করো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর ওপর। (সূরা আশ্ শু'আরা, আয়াত: ২১৭)

তাওয়াক্কুল একটি ইবাদাত। প্রতিটি কাজে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা মু'মিনের জন্য আবশ্যক। মু'মিন ব্যক্তি কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে। কাজ সম্পাদনের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। সে সফল না হলে মুষড়ে পড়বে না। কেননা, তাওয়াক্কুলকারী কখনো হতাশ হয় না। বিপদ-সংকটে ঘাবড়ে যায় না। ঘোর অন্ধকারে আশার আলো দেখে। আল্লাহকে উপকার ও ক্ষতির একমাত্র মালিক বলে বিশ্বাস করে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে। এটি তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

অর্থ: অতঃপর আপনি কোনো সংকল্প করলে তখন আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

কুরআন ও হাদিসে তাওয়াক্কুলের অনেক ফযিলত ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি আল্লাহর ওপর শতভাগ তাওয়াক্কুল করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলা তার রিযিকের জিম্মাদার হয়ে যান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা'আলার ওপর নির্ভরশীল হতে, তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেওয়া হয়, সেভাবে তোমাদেরও রিযিক দেওয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।' (তিরমিযি)

তাওয়াক্কুলের পদ্ধতি

তাওয়াক্কুল মানে চেষ্টা সাধনা না করে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে জীবনোপকরণের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন। তাই জীবন উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। শরিয়ত সমর্থিত উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়; বরং চেষ্টা করার দায়িত্ব আমাদের আর পূর্ণতা দান করবেন আল্লাহ। এ সম্পর্কে হাদিসে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাহন তথা উট কোথায় রেখে এসেছ?' বেদুইন সাহাবি বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! মসজিদের বাইরে বাঁধনমুক্ত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আল্লাহই দেখবেন আমার উট।' তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আগে তোমার উটকে বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো।' (তিরমিযি) এ থেকে বোঝা যায়, পূর্ণ চেষ্টা-সাধনার পর আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, তাওয়াক্কুল হলো তাওহিদের গুরত্বপূর্ণ একটি অংশ। মহান আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান এবং যাবতীয় উপকার ও ক্ষতির একমাত্র মালিক। তাই আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব।

হালাল উপার্জন

মু'মিন জীবনে হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। হালাল উপার্জনের ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মতৎপরতায় আসে পবিত্রতা। স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়। সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে। ধর্মানুরাগী হতে সহায়তা করে।

'হালাল' আরবি শব্দ। এর অর্থ বৈধ ও পবিত্র। সাধারণত শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়কে হালাল বলা হয়। আর উপার্জন হলো, রোজগার ও আয়। সুতরাং হালাল উপার্জন বলতে বিধিসম্মত রোজগার, বৈধ আয়, বৈধ উপার্জন ইত্যাদিকে বুঝায়।

পরিভাষায়, ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় আয়-রোজগার করাকে হালাল উপার্জন বলে। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত পন্থায় কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী উপার্জন করাকে হালাল উপার্জন বলে।

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে হালাল উপার্জনের ওপর। তাই মানবজীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হালাল জীবিকা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। হালাল জীবিকা গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ পালন করা যায়। হালাল উপার্জন ইমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরয ইবাদাতের পর আরেকটি ফরয কাজ।' (বায়হাকি) ইবাদাত কবুলের পূর্বশর্ত হলো হালাল জীবিকা গ্রহণ করা। তাই ইবাদাতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার জন্য হালাল জীবিকা ভক্ষণ করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

অর্থ: হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৮)

হালাল উপার্জন মানুষকে কর্মপ্রেরণা দেয়। নিষিদ্ধ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। অনৈতিক চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত রাখে। পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। ফলে সমাজেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

হালাল উপার্জন করা নবি ও রাসুলগণের সুন্নাত। নবি ও রাসুলগণ হালাল পথে উপার্জন করেছেন। তাঁদের উম্মতকে হালাল পথে উপার্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যে খাবার অর্জিত হয় তা শ্রেষ্ঠতম খাবার। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

অর্থ: নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। (বুখারি)

হালাল উপার্জনকারী আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার পাত্র। আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা হয়। তাই হালাল পথে উপার্জনকারীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পরিবারের জন্য হালাল উপার্জনকারী যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী।' (ইবনে মাজাহ)

মানুষ হালাল উপার্জনের প্রয়োজনে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, হালাল উপার্জনকারী ব্যক্তি কর্মঠ হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই মহানবি (সা.) বলেছেন, 'দক্ষ কারিগরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।'

হালালভাবে অর্জিত অর্থের প্রতি মানুষের মায়া থাকে। তাই অনর্থক ও গুনাহের কাজে টাকা ব্যয় করে না। এতে সমাজ থেকে আর্থিক অনাচার ও অপচয় দূর হয়; দুর্নীতি বিলুপ্ত হয়। অবৈধ ও জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের চিন্তা দূর হয়। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণের কথা মাথায়ও আসে না। ফলে সমাজের সর্বত্র অনিয়ম ও দুর্নীতি কমে আসে। মানুষ নির্দ্বিধায়-নির্বিবাদে তার উপার্জন ভোগ করে। প্রশান্তিতে তার হৃদয় মন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অবৈধভাবে উপার্জনের সম্পদ দ্বারা যে শরীর বা প্রজন্ম গড়ে উঠবে, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তা দিয়ে মানুষের দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হবে। তাদের পরিবার-পরিজনের জীবন নষ্ট হবে। আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। কাজেই হালাল উপার্জনে সবার আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন।

হালাল উপার্জনের উপায়

নিষিদ্ধ ও হারাম পন্থা পরিহার করে কাজের মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়। যেমন: দৈহিক পরিশ্রম তথা কৃষিকাজ, ব্যবসা ও চাকুরি করে। তবে দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে কাজে ফাঁকি দিলে, কাজ যথাযথভাবে না করলে, নির্দেশিত পন্থার বিপরীত করলে তা হালাল হবে না। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অপরের জমি দখল বা অন্যের ক্ষতি করা যাবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে হারাম জিনিসের ব্যবসা করা যাবে না। আবার ব্যবসায় মিথ্যার আশ্রয় নিলে, মাপে কম-বেশি করলে, প্রতারণা ও ধোঁকার আশ্রয় নিলে, সিন্ডিকেট ও মজুদদারী করলে ব্যবসা হালাল হবে না। চাকরির ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করলে উপার্জন হালাল হবে না।

এছাড়াও নার্সারি ও বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ , গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার করা; ছোট-বড় কুটির শিল্প স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে হালাল উপার্জন করা যায়।

মোটকথা, মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপনের জন্য হালাল উপার্জনের বিকল্প নেই। প্রত্যেকটি মানুষ হালাল উপার্জনের চেষ্টা করলে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে উঠবে। এতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আর্থিক অনাচার ও লাগামহীন অপচয় রোধ হবে। আর মানুষের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি হবে। তারা ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করবে।

জোড়ায় কাজ

'দৈনন্দিন জীবনে তাওয়াক্কুল ও হালাল উপার্জন এর চর্চা বা প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো'

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা জোড়ায় পোস্টার/কাগজে উপস্থাপন করো)।

শ্রমের মর্যাদা

প্যানেল আলোচনা

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে তোমরা প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

কর্ম সম্পাদনে দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ব্যয় করাকেই শ্রম বলে। আবার মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সকল প্রকার কায়িক ও মানসিক শক্তি ব্যয়কে শ্রম বলে।

পৃথিবীতে আজও মানুষ শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে, জীবন দিচ্ছে। অথচ প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই ইসলাম শ্রমের মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। নবি-রাসুলগণ জীবিকা উপার্জনের জন্য শ্রম ব্যয় করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবিগণও জীবিকা উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। বিনাশ্রমে উপার্জন করাকে তারা ঘৃণা করতেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রমের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে সুখ আসে।

শ্রমের মর্যাদা

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অতুলনীয়। কেননা, শ্রমই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রম আল্লাহ প্রদত্ত মানব জাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۗ

অর্থ: নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। (সূরা আল বালাদ, আয়াত: ৪)

ইসলামে মালিক-শ্রমিকের মাঝে কোনো বৈষম্য নেই। মালিক পুঁজি দিচ্ছে আর শ্রমিক শ্রম দিচ্ছে। শ্রমিক মালিকের পরিবারভুক্ত। ইসলাম শ্রমিককে 'ভাই' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের দাসরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন। কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে, তবে সে যা খায়, তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা থেকে যেন পরিধান করায়।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও শ্রমিকের সঙ্গে বসে খেতেন।

শ্রম ব্যয় বা কাজ করা হলো নবিগণের সুন্নাত। প্রত্যেক নবিই জীবনে কোনো না কোনো কাজ করেছেন। তাঁরা কাজ করে উম্মতকে শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন: আদম (আ.) কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাশাপাশি হাওয়া (আ.) কাপড় বুনন, সেলাই ও কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে আদম (আ.)- কে সহযোগিতা করতেন। নূহ (আ.) কাঠের কাজ জানতেন, দাউদ (আ.) বর্ম প্রস্তুত করতেন, ইদরিস (আ.) দর্জির কাজ করতেন, শুয়াইব (আ.) ও সালেহ (আ.) ব্যবসা করতেন এবং মুসা (আ.) মেষ চরাতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে

এমন কোনো নবি পাঠাননি যিনি ছাগল ও ভেড়া চরাননি।' তখন সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসুল (সা.) আপনিও? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ! আমিও মজুরির বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরাতাম।' (বুখারি) আমাদের নবি (সা.) নিজেও পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সাহাবায়ে কেরামও নবি (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যেমন: হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) ব্যবসা করেছেন। হযরত আলি (রা.) বিনিময়ের মাধ্যমে কূপ থেকে পানি উঠানোর কাজ করতেন। খাব্বাব (রা.) কর্মকার ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মেষ-বকরি চরাতেন। আনসারগণ সাধারণত কৃষিকাজ করতেন। আর মুহাজিররাগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। মহানবি (সা.) সব কাজেই সমানভাবে উৎসাহিত করতেন।

আল্লাহ তা'আলা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন শ্রমকে ভালোবাসেন। কেননা সর্বোত্তম শ্রমিক সেই যে শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল হয়। এ ধরনের শ্রমিকের জন্য জাহান্নাম হারাম। হাদিসে এসেছে, সা'দ (রা.) কামারের কাজ করতেন। হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে করতে তাঁর হাত দুটি বিবর্ণ ও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন নবি (সা.)-এর সঙ্গে তিনি করমর্দন করলেন। তখন নবি (সা.) সাদ (রা.)-কে হাতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ অবস্থা হয়েছে। নবি (সা.) তাঁর হাত চুম্বন করে বললেন, 'এ হাতকে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।' (বুখারি)

ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিশেষভাবে কায়িক শ্রম একটি উত্তম কাজ। কায়িক শ্রম মানুষের মনে অনন্য আনন্দ সৃষ্টি করে। এর দ্বারা তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে। নিজ হাতে অর্জিত জীবিকা সর্বোত্তম জীবিকা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'এর চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই, যা মানুষ স্বহস্তে উপার্জনের মাধ্যমে ভক্ষণ করে।' (বুখারি)

আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তান হিসেবে মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তাই ইসলামে কোনো শ্রেণিবৈষম্য নেই। কোনো ধরনের শ্রমই ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন নয়। প্রতিটি শ্রমই মর্যাদার। আর কোনো পেশাই ঘৃণিত নয়; বরং পরিশ্রম করা সর্বোত্তম কাজ। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) খেটে খাওয়া মানুষের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন,

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ

অর্থ: শ্রমিক হলো আল্লাহর বন্ধু। (কানজুল উম্মাল)

ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ। যে কাজ না করে ভিক্ষা করবে, সে কিয়ামতের দিন মাংসহীন চেহারায় উঠবে। আর শ্রম দিলে সাহায্যের জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হয় না। তাই শ্রম বিনিময় করা হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম কাজ। মহানবি (সা.) বলেন, 'অন্যের নিকট হাত পাতার চেয়ে দড়ি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া এবং সেখান থেকে কাঁধে জ্বালানি কাঠ বহন করে আনা এবং তা দিয়ে জীবিকা উপার্জন করা উত্তম।' (বুখারি)

শ্রম আমাদের জীবনে এক অপরিহার্য বিষয়। শ্রমকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, আমরা শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করি। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইবাদাত শেষে শ্রম ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা

জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হও।' (সূরা জুমুআ, আয়াত: ১০) তবে কাজকর্ম করতে গিয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া যাবে না।

ইসলাম অলসতার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অলস মস্তিষ্কে শয়তান ধোঁকা দেয় বেশি। শ্রম মানুষকে অনর্থক ও অনৈতিক কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

আল্লাহর কাছে বান্দার শ্রমের মর্যাদা অনেক বেশি। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। আর শ্রমের মাধ্যমেই আখিরাতের সফলতা লাভ করা যায়। তাই আমরা যেকোনো ধরনের শ্রম ও পেশাকে সম্মান করব। নিজেরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিশ্রমী হব।

সমাজসেবা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবসেবা ও সমাজসেবা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলাম ও সমাজসেবা একটির সঙ্গে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর ইসলাম মানুষকে অন্যের কল্যাণে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ

অর্থ: সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ২)

সামাজিকভাবে জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়েই মানুষ সারা জীবন বসবাস করে। সুতরাং সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে স্বেচ্ছায় গৃহীত কাজকে সমাজসেবা বলে। ব্যাপক অর্থে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচিই সমাজসেবা নামে পরিচিত। সাধারণত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে গৃহীত সেবামূলক কার্যক্রমকে সমাজসেবা বলা হলেও সমাজের মানুষকে সহযোগিতা করা, সমাজ ও দেশের উন্নতিকল্পে কাজ করাকেই আমরা সমাজসেবা বলি। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুসারে, 'ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তাদানের লক্ষ্যে গৃহীত ও সংগঠিত কাজের সমষ্টিই সমাজসেবা।'

ইসলামে সমাজসেবার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন: রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করা, দুর্যোগপীড়িত মানুষের সেবা-যত্ন ও সাহায্য-সহযোগিতা করা, কর্মহীন মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, অনাহারী মানুষের আহার যোগানো, পিপাসার্ত মানুষের পিপাসা নিবারণ করা, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, অসহায়-নিঃস্ব ও দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করা, আশ্রয়হীন, কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী মানুষের পুনর্বাসন করা, দারিদ্র্য বিমোচন, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও সেতু নির্মাণ, পরিবেশ উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ করা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস দূরীকরণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি স্থাপন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি পথের কাঁটা বা কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং অন্যের প্রতি মুচকি হাসিও সমাজসেবা।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আমরা অনেক সেবামূলক কাজ করি। আর উত্তম সমাজসেবামূলক কাজ হলো- নিঃস্ব, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের খাদ্য দান করা। এসবের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিম ইয়াতিমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত পানাহার করাবে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।' (আহমাদ) অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟
قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, 'তুমি (অভাবীকে) খাবার খাওয়াবে।'(বুখারি)

সমাজে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ বাস করে। তাদের সকলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমান নয়। তাদের সুযোগ-সুবিধাও সমান নয়। কেউ বিপুল সম্পদের অধিকারী আবার কেউ নিঃস্ব। সম্পদশালী ব্যক্তিগণ অভাবী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও সম্পদ ব্যয় করবেন। সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়বেন। এটাই ইসলামের নির্দেশ। কেননা, ধনীদের সম্পদে নিঃস্বদের অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ: এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক। (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

সম্পদশালী ব্যক্তিরা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়লে সমাজের অভাবী লোকেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তারা বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পাবে। দেশের উন্নয়নের বাধাসমূহ দূর হবে।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা ছাড়া দ্বীন বোঝা যায় না। দুনিয়া বোঝা যায় না। সমাজ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বিত্তশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা সমাজকে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়বেন। যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, তাহলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে। কেননা মহান আল্লাহ আমাদের জ্ঞানার্জনের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয। হাদিসে বলা হয়েছে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। (ইবনে মাজাহ)

সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজার রাখা মু'মিনের দায়িত্ব। সংশোধনমূলক প্রতিটি কার্যক্রমই সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ সৃষ্টি হলে তা দূর করতে হবে। কারণ, বিশৃঙ্খলা সমাজের পরিবেশকে নষ্ট করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অর্থ: ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯১)

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও কলহ মেটানোও সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯)

ছোটবেলা থেকেই জনসাধারণের উপকারে আসে এমন কাজের অভ্যাস করা দরকার। যেমন: ভাঙা রাস্তা মেরামত করা, নতুন রাস্তা নির্মাণে সাহায্য করা, পুল-সাঁকো নির্মাণ করা, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা করা, আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া, বৃক্ষরোপণ করা, পরিবেশ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

সমাজসেবা একটি ইবাদাত। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। সমাজসেবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম)

অতএব বলতে চাই, আমরা সব সময় সমাজের সেবা করব। সমাজকে ভালো করে গড়ে তুলব। সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। মানবসেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করব।

সৌহার্দ্য ও সাম্য

ইসলাম সাম্য, মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও শান্তির ধর্ম। মহানবি (সা.) সবার প্রতি সহনশীলতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের অগ্রদূত ছিলেন। পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি হচ্ছে ইসলামের চিরায়ত সৌন্দর্য। সৌহার্দ্য ও সাম্যের সর্বোত্তম উদাহরণ হলো মদিনার আনসারগণ। তাঁরা নিজেরা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও মুহাজিরগণের জন্য ধন-সম্পদ ও আপন স্বার্থ ত্যাগ করেছিলেন। তাদের এই ত্যাগ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তারা (আনসার সাহাবিগণ) তাদেরকে (মুহাজিরগণকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।' (সূরা হাশর, আয়াত: ০৯)

সৌহার্দ্য অর্থ, বন্ধুত্ব, মিত্রতা, সৌজন্য, প্রীতি, মৈত্রী, সদ্ভাব, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইত্যাদি। আর সাম্যের অর্থ হলো সমতা ও সাদৃশ্য। সাম্য অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনি সাম্য। ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান।

গুরুত্ব

ইসলামে সৌহার্দ্য ও সাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে অন্যায়-অবিচার, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, হানাহানি-মারামারি, ধর্মের নামে যুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ফিতনা-ফ্যাসাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান। কেননা, সবাই এক আদমের সন্তান। আর আদম (আ.) মাটি থেকে সৃষ্টি। প্রিয় নবি (সা.) বর্ণবৈষম্য ও আভিজাত্যের গর্বকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তিনি একতা, সাম্য-মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও শান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই শান্তিকে সর্বস্তরে সুদৃঢ় করতে মহানবি (সা.) 'মুসলমান' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'যার হাত ও মুখ থেকে অন্যেরা নিরাপদ নয়, সে প্রকৃত মুসলমান নয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুন্দর সামাজিক পরিবেশের জন্য সৌহার্দ্য ও সাম্যের খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো, অত্যাচার-নির্যাতন ও নিপীড়ন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ
اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز

অর্থ: কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর। (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৮)

মহানবি (সা.) ধনী-গরিব, বর্ণ-গোত্র বা বংশ গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১১)

জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি সবার সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা, সবাই একই পরিবারভুক্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বিশ্বজগৎ আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের প্রতি সর্বাপেক্ষা উত্তম।' (তাবরানি)

শুরু থেকেই ইসলাম মানবাধিকার, সাম্য, সৌহার্দ্য ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কথা বলছে। বাস্তবজীবনে তা প্রয়োগ করতে কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। ইবাদাতের সমতার জন্য সারিবদ্ধভাবে সালাত আদায় করতে বলেছে। রাষ্ট্রপ্রধান ও ভিখারি সালাতে একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়াতেও কোনো বাধা নেই। ধনী-গরিবের বৈষম্য রোধ করতে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। রোযা, ঈদ, কুরবানি, হজ সব ইবাদাতের মধ্যে সাম্যের বীজ বপন করে রেখেছে।

ইসলাম ন্যায়নিষ্ঠার ধর্ম। সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা মু'মিনের দায়িত্ব। কেননা, কল্যাণকর কাজ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় মানুষ কে? তিনি উত্তর দিলেন, 'ঐ ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকারী।' (তাবরানি)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্রে সব সময় সৌহার্দ্য, সাম্য ও মৈত্রীর চমৎকার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সাহল বিন সাদ (রা.) বলেন, 'একজন নারী নবিজির জন্য সুন্দর কারুকার্য করা একটি চাদর এনে বললেন, আমি এটি নিজ হাতে তৈরি করেছি। আপনি তা পরিধান করলে আমি খুশি হব। রাসুলুল্লাহ (সা.) কাপড়টি গ্রহণ করলেন। তাঁর কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল। যখন তিনি তা লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে ঘরের বাইরে এলেন, এক ব্যক্তি বলল, খুব চমৎকার কাপড় তো! আমাকে তা দান করবেন কি? তখন নবিজি ঘরে গিয়ে তা খুলে ভাঁজ করে লোকটির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে অন্যান্য সাহাবি ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, আরে ভাই! তুমি কি জানো না, কাপড়টি নবিজির প্রয়োজন রয়েছে। আর তিনি কোনো কিছু চাইলে 'না' বলেন না। লোকটি জবাবে বলল, আমি সবই জানি, এরপরও চেয়েছি, যাতে তাঁর শরীর মুবারকের স্পর্শে ধন্য কাপড় দিয়ে আমি নিজের কাফন বানাতে পারি। বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর সেই কাপড়েই তাকে দাফন করা হয়েছিল।' (বুখারি)

এছাড়া সাম্যের প্রতীক মহানবি (সা.) এক ইহুদি মহিলার দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এক ইহুদির লাশ দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সবার জন্য মহানবির সাক্ষাৎকারের দরজা সব সময় খোলা ছিল। আর বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'মানব সন্তান আদম (আ.) থেকে এবং আদম (আ.) মাটি থেকে সৃষ্ট। একের ওপর অন্যের প্রাধান্য নেই।'

এক মুসলমান অপর মুসলমানের কল্যাণে কাজ করবে। পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসবে। ক্ষুধার্ত হলে খাবার দেবে। দাওয়াত করলে সাড়া দেবে। অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করবে। তাকে মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফনে শরিক হবে।

এসব বিষয়ের প্রতি ইসলামে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে।' (মুসলিম)

মুসলমানদের মধ্যকার শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব দূর করার যেমন তাগিদ দিয়েছে ইসলাম, তেমনি অন্যান্য ধর্ম ও জাতির লোকদের সঙ্গেও সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বজায় রাখার নির্দেশও দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর শপথ, সে প্রকৃত মু'মিন নয়, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামের এই অনুপম আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারলে সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। আর অশান্তি ও দুঃখ-বেদনা থেকে মানবতা মুক্তি পাবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'সমাজেসেবামূলক কর্মকাণ্ডে আমি নিজেকে যেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারি'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি নিজেকে যেভাবে সমাজসেবায় যুক্ত করবে তা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকাশ করো।)

শিশুদের প্রতি সদাচার

সদাচার সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, কদাচার দুঃখ-দুর্দশার পথে নিয়ে যায়। শিশুদের সঙ্গে কোমল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। শিশু-কিশোরদের মন খুবই সহজ-সরল, কোমল ও পবিত্র। যদি শিশুদের সঙ্গে কোমল আচরণ করা হয়, তাহলে তারা নিরাপদে বেড়ে উঠবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশ্বকে একটি 'শিশুবান্ধব' সমাজ উপহার দিয়ে গেছেন।

শিশু হলো ব্যক্তির ভূমিষ্ঠকালীন প্রাথমিক রূপ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো মানব সন্তানকেই শিশু বলা হয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেও ০-১৮ বছর বয়সসীমার মধ্যে অবস্থানকারীদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি এমন মানব সন্তানই হলো শিশু।

সদাচার অর্থ শুদ্ধ আচরণ, উত্তম আচরণ, ভালো ব্যবহার ইত্যাদি। শিশুদের প্রতি সদাচার হলো শিশুদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা।

সদাচার মানুষের একটি মহৎ গুণ। এটি শিশুদের অন্তর জয়ে সাহায্য করে। তাই মু'মিনের উচিত শিশুদের ভালোবাসা, আদর করা, সালাম দেওয়া, কোমল ব্যবহার করা, তাদের সঙ্গে নরম গলায় কথা বলা, তাদের চুমু খাওয়া। কেননা, এগুলো মহানবি (সা.)-এর শিক্ষা। নবি করিম (সা.) নিজেও শিশুদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন। শিশুদের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিশুদের প্রতি সদাচার করলে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি হয়। শিশুদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ ইমানের অংশ। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

অর্থ: যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযি)

সদাচরণ ইসলামের সৌন্দর্য। সন্তানদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, তাদের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শিষ্টাচার শিক্ষা

দেওয়া, সুন্দর নামে ডাকা, নামাযে অভ্যস্ত করা, উন্নত বাচনভঙ্গি, শুদ্ধ উচ্চারণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। এগুলো শিশুদের প্রতি সদাচারের অংশ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা শিশুদের স্নেহ করো, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো এবং সদাচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।' (তিরমিযি) তিনি অপর হাদিসে বলেন, 'সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান-খয়রাতের চেয়েও উত্তম।' (মুসলিম)

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা হলো শিশুদের সঙ্গে সদাচরণ করা। শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করা, কৌতুক করা, গল্প করা, সময় দেওয়া, তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, নতুন জামা-কাপড় কিনে দেওয়া, উপহার দেওয়া, ধর্মীয় কর্তব্যপালনে আগ্রহী করে তোলা, ভালো কাজের প্রশংসা করা, তাদের মনের অভিব্যক্তি বুঝতে পারা, মৌলিক চাহিদা পূরণ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করাও সদাচার।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম-অমুসলিম সব শিশুকেই ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। তিনি তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন। মহানবি (সা.) মাঝে মাঝে উপুড় হয়ে দুই নাতি হাসান ও হোসাইন (রা.)-কে পিঠে সওয়ার হতে দিতেন। অনেক সময় মহানবি (সা.) যখন নামাযে সিজদায় যেতেন, শিশু নাতিদ্বয় তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। নাতিরা তাঁর পিঠ থেকে না নেমে আসা পর্যন্ত তিনি সিজদারত অবস্থায় থাকতেন। কখনোই বিরক্তিবোধ করতেন না। নিষেধও করতেন না। মসজিদে কোনো শিশু এলে তাকে তিনি সামনে ডেকে নিতেন। সফর থেকে ফেরার পর ছোট ছেলেমেয়েদের উটের সামনে-পেছনে বসাতেন এবং তাদের সঙ্গে আনন্দ করতেন। তিনি ছোটদের আদর করে কাছে বসাতেন। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। তাদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতেন। শিশুদের কষ্টের কথা ভেবে তিনি ফরয নামাযের জামায়াত সংক্ষিপ্ত করার কথা বলেছেন। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও শিশুদের খোঁজখবর নিতেন। এভাবেই রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশুদের প্রতি সদাচার করতেন।

মহানবি (সা.)-এর জীবনে শিশু-কিশোরদের প্রতি সদাচারের অনেক ঘটনা বিদ্যমান। একবার মসজিদে খুতবা দেওয়ার সময় হাসান-হোসাইন লাল জামা পরিধান করে নানার দিকে এগিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের দেখে আর থাকতে পারলেন না। তিনি খুতবা স্থগিত রেখে তাদের কোলে তুলে সামনে এনে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর আবার খুতবা শুরু করলেন। (ইবনে মাজাহ) শিশুদের কোনো ধরনের আচরণেই তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না। একবার তিনি এক শিশুকে কোলে নিয়ে মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলেন। এমন সময় শিশুটি তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিল। কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না; বরং নিজেই পানি দিয়ে ওই স্থানটি ধুয়ে নিলেন।

এতিম শিশুদের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরদ ছিল আরো বেশি। একবার ঈদের দিন সকালবেলা নবিজি (সা.) দেখলেন, এক শিশু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁদছে। পরনে তার ছিন্ন বস্ত্র। সারা শরীরে কাদা। শিশুটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে সে এতিম। এ কথা শুনে নবিজির খুব খারাপ লাগল। শিশুটির প্রতি তাঁর মায়া হলো। শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। স্ত্রী আয়েশা (রা.)-কে বললেন, শিশুটিকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে দাও। আয়েশা (রা.) তাকে গোসল করিয়ে দিলেন। এরপর প্রিয় নবি নিজ হাতে তাকে নতুন পোশাক পরিয়ে দিলেন। অতঃপর ঈদের নামায পড়তে নিয়ে গেলেন। আদর করে শিশুটিকে বললেন, 'আজ থেকে আমি তোমার পিতা আর আয়েশা তোমার মা।'

শিশুদের কোমল ও পবিত্র মনে কোনো খারাপ ধারণা প্রবেশ করলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সেটা থেকে যায়। তাই শিশুদের সত্য কথা বলা ও সত্য পথে চলার জন্য অভ্যস্ত করানো উচিত। তাদের সঙ্গে সদা সত্য বলা উচিত। কর্কশ ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের দেওয়া ওয়াদা পূরণ করা, তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করা, রাগ না করা, উপহাস না করা, গালি না দেওয়া, অবহেলা না করা, অভিশাপ না দেওয়া, তাদের আচরণে বিরক্ত না হওয়া ইত্যাদিও সদাচার। যেমন: আনাস (রা.) দীর্ঘ ১০ বছর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেবায় কাটিয়েছেন। নিজের শৈশবের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার কোনো কাজে কখনো আপত্তি করে বলেননি যে, এমনটি কেন করেছ বা এমনটি কেন করোনি।' (মুসলিম)

আজকের শিশুই আগামী দিনের দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই শিশুদের সঙ্গে যদি সদাচার করা হয়, তাদের সদাচার শিক্ষা দেওয়া হয়, ইসলামের নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে মাতা-পিতা, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র তাদের সেবা লাভে উপকৃত হবে। সুন্দর হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবী।

আত্মমূল্যায়ন (অভিভাবকের চোখে নিজেকে দেখি)

পরিবার বা প্রতিবেশি, মা-বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠ, শিশুর কাছে আমি কেমন?
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি ৫ থেকে ১০ জন ব্যক্তির মন্তব্য সংগ্রহ করো। এক্ষেত্রে, মন্তব্যকারী ব্যক্তি স্বাক্ষর দিতে সক্ষম হলে স্বাক্ষরসহ নির্ধারিত ছকটি প্রতিফলন ডায়েরিতে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক জমা দিবে)।

মন্তব্যকারী	আমাকে নিয়ে আপনার (পরিবারের সদস্য/ প্রতিবেশি) মন্তব্য বা ভাবনা	স্বাক্ষর
বাবা		
মা		
ছোট বোন		
দাদা (প্রতিবেশি)		

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাতা-পিতা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। তাঁদের মাধ্যমেই সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখতে পায়। মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সন্তান জন্ম দেন এবং লালন-পালন করেন। মাতা-পিতার একান্ত আদর-যত্নে ছোট শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। রোগ-শোকে ও বিপদ-আপদে তাঁরা সন্তানকে আগলে রাখেন। তাঁদের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর

অসন্তুষ্টি। মাতা-পিতার ঋণ শোধ করা সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেগুলো আদায়ের মাধ্যমে সন্তান জান্নাত লাভ করতে পারবে। সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো:

মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা, বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁদের উপহার দেওয়া ইত্যাদি। মাতা-পিতা অসহায় শিশুকে যেমন পরম স্নেহে, আদর-যত্নে ও ভালোবাসায় লালন করেন, সর্বাবস্থায় তাঁদের সাথে তেমনি সর্বোত্তম আচরণ করা উচিত। কেননা, মাতা-পিতা খুশি থাকলে আল্লাহ্ও খুশি থাকেন। মাতা-পিতা বিধর্মী হলেও তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؕ

অর্থ: আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত না করতে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩)

প্রত্যেক সন্তানের উচিত মাতা-পিতাকে কষ্ট না দেওয়া, তাঁদের ধমক না দেওয়া, গালমন্দ না করা, কর্কশ ভাষা ব্যবহার না করা, অসম্মান না করা, বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের শিশুসুলভ আচরণ সহ্য করতে হবে। তাঁদের কথাবার্তা বা আচরণে বিরক্তি প্রকাশ না করে তাদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করা সন্তানের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না; তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো।' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩)

মাতা-পিতার আনুগত্য করা সন্তানের কর্তব্য। যেকোনো বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তাঁরা ইসলামবিরোধী কোনো কাজের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সকল আদেশ পালন করা উচিত। তাদের সঙ্গে সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলা এবং তাঁদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকানো উচিত। তবে মাতা-পিতার সঙ্গে নাফরমানি করা হারাম। তাঁদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

অর্থ: তাঁরা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ)

সন্তানের আরো কর্তব্য হলো বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে সঙ্গ দেওয়া, মাতা-পিতা অক্ষম হলে তাঁদের সার্বিক দায় দায়িত্ব নেওয়া, তাঁদের ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা, আর্থিক সহযোগিতা করা, তাঁদের অসুবিধা দূর করা, তাঁরা অসুস্থ হলে সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাঁদের পরিচর্যা এবং সেবা করা উচিত। অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে মাতা-পিতা অক্ষম হয়ে পড়লে তাঁদের সহযোগিতা করা সন্তানের কর্তব্য।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর কর্তব্য

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব হলো–তাঁদের কাফন-দাফন করা, তাঁদের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করা, সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে তাঁদের কৃত ওয়াদা ও অসিয়ত পূর্ণ করা, তাঁদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী সাদকাহ করা, ওয়ারিশদের মাঝে তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা ইত্যাদি। অসিয়ত পূর্ণ করার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। এমনকি মাতা-পিতার আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা সন্তানের দায়িত্ব। দোয়ার ভাষাটি আল্লাহ তা‘আলা নিজেই শিখিয়ে দিয়ে বলেন,

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

অর্থ: এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৪)

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং মু‘মিনদেরকে ক্ষমা করো। (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪১)

মোটকথা, মাতা-পিতার খেদমত করা ইবাদাত। তাঁদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করাও ইবাদাত। যারা মাতা-পিতার হক আদায় করে না তাদের ধ্বংস অনিবার্য। মহানবি (সা.) একদা তিনবার বললেন, ঐ লোক ধ্বংস হয়ে যাক। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কে সে? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।’ (মুসলিম)

মাতা-পিতাকে অভিশাপ দেওয়া কবিরা গুনাহ। তাই আমরা মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখব। তাঁদের প্রতি সমস্ত কর্তব্য পালন করব। তাঁরা আমাদের মঙ্গল চান। তাঁদের আদেশ-নিষেধ আমরা সবসময় মেনে চলব।

প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা ও অধিকার

বার্ধক্য বা প্রবীণ একটি জৈবিক অবস্থা। যা মানব জীবনচক্রের শেষ ধাপ। সকলকেই এ নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। আজ আমাদের মাঝে যাঁরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। তাঁরা আমাদের অগ্রজ এবং সমাজের সার্থক রূপকার। আমরা তাদের জীবনব্যাপী আত্মত্যাগের চরম সুবিধাভোগী। তাই ইসলাম প্রবীণদের দিয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার।

সাধারণ অর্থে প্রবীণত্ব বলতে শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে বুঝায়। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা এবং প্রবীণ বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিকে প্রবীণের হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক। বর্তমান বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা ১.৬০ কোটি। যা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। জনসংখ্যাবিদদের ধারণা ২০২৫ সালে দেশে প্রবীণের সংখ্যা হবে ২.৮০ কোটি এবং ২০৫০ সালে হবে ৪.৫০ কোটি। ২০৫০ সালে প্রবীণের সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ।

প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সব সমাজেরই অনুসরণীয় রীতি। সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ঐতিহ্য আজও মোটামুটি লক্ষ করা যায়। তারপরও কিছু কিছু বৃদ্ধকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হয়। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রবীণরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা নয়; বরং দুনিয়া ও পরকালের সফলতার অনন্য অনুপ্রেরণার মাধ্যম। ইসলাম প্রবীণদের অসম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েছে। প্রবীণদের সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং অধিকার সুনিশ্চিতে বিশ্বনবি (সা.)ও তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (তিরমিযি)

প্রবীণদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। তাই মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত। কেননা, প্রবীণদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রবীণদের সঙ্গেই তোমাদের কল্যাণ ও বরকত আছে।' (ইবনে হিব্বান)

জ্ঞানীকে তার জ্ঞানের জন্য আর বৃদ্ধকে তার বয়সের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। যারা ইসলামের এ বিধান মানবে না, তারা অবশ্যই আল্লাহর সামনে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে। বস্তুত প্রবীণদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের মাঝেই আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিহিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

অর্থ: নিশ্চয়ই সাদা চুলবিশিষ্ট বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

ইসলাম প্রবীণদের মূল্যায়ন ও সম্মান করেছে। তাদেরকে সালামে অগ্রাধিকার এবং সালাত আদায়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যেমন: দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে অক্ষম হলে বসে আদায় করবে। তাতেও যদি অক্ষম হয়, তাহলে শুয়ে শুয়ে আদায় করবে। এমনকি প্রবীণদের সম্মানে নবি করিম (সা.) ইমামকে সালাত সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, ইমামতিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন, সাওম পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন। অতিবৃদ্ধ বা প্রবীণ ব্যক্তি যদি সাওম পালনে অক্ষম হন, তাহলে প্রতিটি সাওমের বিনিময়ে একজন করে মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। বিনিময়ে প্রবীণদের সাওম রাখায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। হজ পালনে শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য বদলি হজের বিধান দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নৈকট্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ও জ্ঞানী

লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর পর্যায়ক্রমে দাঁড়াবে যারা তাদের কাছাকাছি। তারপর দাঁড়াবে যারা তাদের কাছাকাছি তারা।' (মুসলিম) এছাড়াও ইসলামে প্রবীণদের ইবাদাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেহেতু প্রবীণরা শারীরিক কারণে ইবাদাত করতে কষ্ট হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ইবাদাত কবুল করেন।

ইসলামের শিক্ষা হলো: সন্তানের অসহায়ত্বের সময় মাতা-পিতা যেভাবে প্রতিপালন করেন, মাতা-পিতার বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁদের সেভাবে যত্ন নেওয়া সন্তানের কর্তব্য। এখানেই শেষ নয়, মাতা-পিতা অমুসলিম হলেও তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা অমানবিক ও ইসলাম বিবর্জিত কাজ। এমন কাজ যারা করে তাদের কোনো ক্ষমা নেই। অন্যদিকে বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে প্রাপ্য মর্যাদা না দেওয়ায় পারিবারিক অশান্তি হচ্ছে। পরিবার প্রথা হুমকির মুখে পড়ছে। আর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রবীণদের অবদান অপরিসীম। এক সময়ে তাঁরা বার্ধক্যে উপনীত হন। তখন প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা করা সমাজের আবশ্যিক কর্তব্য। প্রবীণরা ভালোবাসা, সেবা-যত্ন ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য অধিকারী। এছাড়াও কথা বলা ও আসন পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া, অভাবী হলে আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন করে প্রয়োজনীয় দেখাশোনা, খাবার-দাবার, চিকিৎসা, বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা ইত্যাদি হলো প্রবীণদের অধিকার।

মোটকথা, প্রবীণদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং প্রয়োজন পূরণ করা সবার কর্তব্য। বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের এটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি কোনোরূপ অবজ্ঞা নয়, কোনো বৈষম্য নয়। প্রবীণের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, মমতা ও ভালোবাসা হোক সকলের অঙ্গীকার। প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁদের অধিকার আদায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।

দলগত কাজ

তুমি তোমার মা-বাবা, পরিবার বা প্রতিবেশি বয়োজেষ্ঠ্যদের সম্মান, শ্রদ্ধা কীভাবে প্রদর্শন করো বা করবে তা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক সহপাঠীর সাথে আলোচনার করে উপস্থাপন করো।

আখলাকে যামিমাহ (নিন্দনীয় চরিত্র)

'যামিমাহ' শব্দের অর্থ মন্দ, অপছন্দনীয়, নিন্দনীয় ইত্যাদি। 'আখলাকে যামিমাহ' অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি। মানবজীবনের নিকৃষ্ট, মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। যেমন: অহংকার, ঘৃণা, মিথ্যাচার, সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা, প্রতারণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব-অহংকার ইত্যাদি। 'আখলাকে যামিমাহ' হলো 'আখলাকে

হামিদাহর’ সম্পূর্ণ বিপরীত। বতর্মান পাঠে আমরা পরশ্রীকাতরতা, অশ্লীলতা, মাদকাসক্তি, অপবাদ ও ঘুষ সম্পর্কে জানব।

পরশ্রীকাতরতা

পরশ্রীকাতরতা অর্থ অন্যের ভালো বা উন্নতিতে হিংসা প্রকাশ করা, অন্যের সৌভাগ্য সহ্য করতে না পারা। অন্যের মান-সম্মান, ধন-দৌলত, পদোন্নতির কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে তার ধ্বংস কামনা করাকে পরশ্রীকাতরতা বলে। পরশ্রীকাতর মানুষ অন্যের ভালো কাজে সহযোগিতা করে না, বরং বাধা সৃষ্টি করে। হিংসার বশবর্তী হয়ে, যেকোনো উপায়ে অন্যের উন্নতি ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তিতে বাধা দেয়। অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে। নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। ফলে সমাজের মানুষের মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শান্তি বিনষ্ট হয়।

কুফল

পরশ্রীকাতরতা একটি ঘৃণ্য মানসিকতা যার কারণে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইসলামি শরিয়তে পরশ্রীকাতরতাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে সম্মানিত করলে ইবলিস শয়তান আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে। এ কারণে সে অভিশপ্ত ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। পরশ্রীকাতরতার মূল কারণ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম-অহংকার, নেতৃত্বের প্রতি লোভ, অন্যকে হীন ভাবার প্রবণতা। পরশ্রীকাতরতার কারণেই মানব সমাজে প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয়। হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল তার আপন ভাই হাবিলের প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে তাকে হত্যা করে। এভাবে পরশ্রীকাতরতার কারণে পাপাচার বৃদ্ধি পায়। তাই হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পরকে হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি ষড়যন্ত্র করো না ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পর আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারি)

হিংসুক ব্যক্তি সব সময় অন্যের উন্নতি দেখে কষ্ট পায়। অন্যের সৌভাগ্য সহ্য করতে পারে না। সে সব সময় হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। সব সময় অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা করে। ফলে তার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। কোনো কিছুই শান্তিতে উপভোগ করতে পারে না। সে নিজের কাজেও যথাযথভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। ফলে তার আত্ম-উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাকে, সে নিজের কাজে মনোযোগ দিতে পারে, একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভে ধন্য হয়। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) একজন সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কী আমল করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) আপনাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে উত্তম কিছু দান করলে, আমি তার প্রতি কখনোই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমরা অনেক কষ্ট করে সৎ কাজ করি। এর প্রতিদানে আল্লাহ আমাদের সাওয়াব দেন। কিন্তু পরশ্রীকাতরতা আমাদের সাওয়াবগুলো ধ্বংস করে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, আগুন যেভাবে লাকড়ি জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, হিংসাও তেমন মানুষের সৎকর্মসমূহকে জ্বালিয়ে দেয় বা নষ্ট করে দেয়।' (আবু দাউদ) রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্য হাদিসে বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা হয় না। তন্মধ্যে একজন এমন, যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে'। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

পরশ্রীকাতরতা মানুষকে সৎকর্ম বিমুখ করে তোলে। পরশ্রীকাতর মানুষ নেতিবাচক চিন্তা-চেতনার মাঝে ডুবে থাকে। অন্যকে হীন ও ছোট মনে করে। সুযোগ পেলেই অন্যকে অপমান-অপদস্থ করে। ফলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি বৃদ্ধি পায়, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব অন্যের কল্যাণ কামনা করা, যেন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

অর্থ: পারস্পরিক কল্যাণ কামনাই দ্বীন (ধর্ম)। (মুসলিম)

মু'মিন ব্যক্তি কখনও অন্যের সৌভাগ্যে অসন্তুষ্ট হতে পারে না। সে নিজের ও অন্যের জন্য সৌভাগ্য প্রত্যাশা করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করো (বুখারি)। পরশ্রীকাতরতার কারণে পূর্ববর্তী অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের রোগ তোমাদের মাঝে সংক্রামিত হয়েছে। আর তা হলো হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। ঘৃণা মুণ্ডন (দ্বীনকে ধ্বংস) করে দেয়।' (তিরমিযি)

অন্যের উন্নতি বা ভালো কাজ করতে দেখে, নিজের জন্যও ভালো কিছু কামনা করায় ক্ষতি নেই। যেমন জ্ঞান অর্জন বা দান-সদকা করার ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবিগণ অন্যকে ভালো কাজ করতে দেখলে নিজেও তেমন ভালো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। আল্লাহর নিকট দয়া চাইতেন, যেন আল্লাহ তাকেও এমন নিয়ামত দান করেন। মহান আল্লাহ পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করো।' (সূরা মায়েদা, আয়াত: ২) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতা করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার অপর ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।' (মুসলিম)

পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অন্যদিকে পরশ্রীকাতরতার কারণে একজন অপরজনের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, অন্যের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের উচিত হিংসুকের হিংসা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিংসুকের হিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ: আর হিংসুকের (পরশ্রীকাতরের) অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে। (সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ৫)

পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পেলে, পরশ্রীকাতরতা দূর হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য সালাম আদান-প্রদান করতে আদেশ দিয়েছেন। সাধ্যমতো পারস্পরিক উপহার আদান-প্রদান করতে বলেছেন। আমরা একে অপরকে ভালোবাসব, কখনো অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করব না, পরশ্রীকাতর হবো না। আমরা সবাই মিলেমিশে বসবাস করব, সুন্দর সমাজ গড়ে তুলব।

অপবাদ

দলগত কাজ

পরশ্রীকাতরতা, অপবাদ ইত্যাদির ক্ষতিকর দিকগুলোর তালিকা তৈরি করে তোমরা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টারে) করো।

অপবাদ শব্দের অর্থ কুৎসা রটনা করা, বদনাম করা, মিথ্যা দোষারোপ করা, মিথ্যা নিন্দা করা ইত্যাদি। কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়াকে অপবাদ বলে। অপবাদকে আরবিতে ‘তুহমত’ ও ‘বুহতান’ বলে। অন্যের নামে অপবাদ দেওয়া একটি জঘন্য অপরাধ। অন্যের নামে অপবাদদাতাকে মানুষ বিশ্বাস করে না, সবাই তাকে ঘৃণা করে। অনেক সময় অপবাদের কারণে একজন নির্দোষ মানুষ সমাজে দোষী হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়। ফলে তার মান-মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে যায়।

অন্যের নামে অপবাদ ছড়ানো প্রতিটি সমাজেই ঘৃণিত কাজ হিসেবে স্বীকৃত। ইসলাম সকল ধরনের অপবাদকে হারাম ঘোষণা করেছে। মিথ্যা বলা সকল গুনাহের মূল। কারো ওপর অপবাদ দেওয়া হলো জঘন্যতম মিথ্যা। কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে–

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

অর্থ: মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানত তথা অভিসম্পাত। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৬১)

অহেতুক একে অপরকে দোষারোপ করা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এর অন্যতম মাধ্যম। একটা বিষয় সত্য কি না, তা না জেনেই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে সবার সচেতন থাকা জরুরি। যেহেতু অজ্ঞতা ও সন্দেহের বশে অপবাদ দেওয়ার ঘটনাই সবচেয়ে বেশি ঘটে, সেহেতু ধারণার ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কোনো দোষ চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের উচিত মানুষের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করা এবং অনুমান করা থেকে দূরে থাকা। যার কাছে অন্যের বিরুদ্ধে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তার উচিত অন্ধভাবে তার কথা বিশ্বাস না করে তা যাচাই-বাছাই

করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা বেশির ভাগ অনুমান থেকে দূরে থেকো।’ (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)

অপবাদ দেওয়া হয় ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে। অপবাদের মাধ্যমে সাময়িক নির্দোষ ব্যক্তির চরিত্রে কালিমা লেপন করা হলেও এর পরিণতি ভয়াবহ। সচ্চরিত্রা নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া ভয়াবহ অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মু’মিন নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখিরাতে) আছে চরম শাস্তি।’ (সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৩)

ইসলামে অপবাদের শাস্তির বিধান রয়েছে। যারা কোনো সৎ ও নির্দোষ নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাদের অবশ্যই চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে। চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে না পারলে প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হবে। ইসলামি আদালতে কারো ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং তখন থেকে তাদের পরিচয় হবে ফাসিক তথা পাপাচারী। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা সৎ নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল, অথচ চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে পারেনি, তাহলে তোমরা তাদের ৮০ বেত্রাঘাত করো, কারো ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ কোরো না এবং তারাই তো সত্যিকার ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় (তারা সত্যিই অপরাধমুক্ত)। কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।’ (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪-৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা কি জানো, গিবত কাকে বলে? সাহাবিগণ বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) ভালো জানেন।’ তিনি বলেন, ‘তোমার কোনো ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গিবত। রাসুলুল্লাহ (সা.) কে সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমি যে দোষের কথা বলি, সেটা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলেও কি গিবত হবে?’ উত্তরে রাসুল (সা.) বলেন, ‘তুমি যে দোষের কথা বলো, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তবে তুমি অবশ্যই গিবত করলে আর তুমি যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছ।’ (মুসলিম)

গিবত বা পরনিন্দা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ। গিবত করা যেমন অপরাধ, একইভাবে ইচ্ছাকৃত গিবত শোনাও অপরাধ। আমাদের সামনে কেউ যখন অন্যের গিবত করে, তখন তাকে থামতে বলা উচিত। নয়তো সেখান থেকে সরে আসা উচিত। প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন, ‘পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না’ (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসুল (সা.) ভিত্তিহীন কথা বলতে ও কোনো খবর যাচাই না করেই প্রচার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যা শোনে তা-ই বলতে থাকা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।’ (মুসলিম)

মিথ্যা অপবাদে মানুষের সম্মানহানি ঘটে। কারো সম্মানহানি করার অধিকার অন্যের নেই। যে অপর ভাইয়ের ইজ্জত খাটো করে, তার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে যদি

এমন স্থানে লাঞ্ছিত করে যেখানে তার সম্মানহানি হয় আল্লাহ তাকে এমন স্থানে লাঞ্ছিত করবেন, যেখানে তার সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিল।' (আবু দাউদ)

অপবাদ কখনো কখনো কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া কুফরি। অপবাদের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট করা হয়। কারো ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হলে সে ক্ষমা না করলে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। তাই আমাদের উচিত অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

পরশ্রীকাতরতা ও অপবাদ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা অনুসন্ধান
শিক্ষকের সহযোগিতায় পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে পরশ্রীকাতরতা ও অপবাদ বিষয়ক ইসলামের বিধি বিধান, নির্দেশনা খুঁজে বের করো। এক্ষেত্রে, তুমি প্রয়োজনে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মতবিনিময় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, অনলাইন সোর্স ইত্যাদির সহায়তা নিতে পারো। প্রাপ্ত বিধি বিধান বা নির্দেশনা পরবর্তীতে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করবে।

ঘুষ

ঘুষ অর্থ উৎকোচ, বেতনের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক, অবৈধ উপহার ইত্যাদি। প্রতিটি কাজের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা পান। কোনো কাজের জন্য অসদুপায়ে বেতনের অতিরিক্ত অর্থ বা উপহার গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবা গ্রহীতাকে সেবা গ্রহণের জন্য অর্থ দিতে বাধ্য করে, আবার অনেক সময় সেবা গ্রহীতা নিয়ম-বহির্ভূত অনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে থাকে। উভয় প্রকার সুবিধা আদান-প্রদানই ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ জঘন্য অপরাধ।

ঘুষের পরিধি অনেক বিস্তৃত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন অন্যজনের কাছ থেকে কোনো কিছুর বিনিময়ে অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করলেও তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি কেউ অন্যের জন্য সুপারিশ করে তার বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করলে তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করল এবং সে এর বিনিময়ে উপহারস্বরূপ তাকে কিছু দিল, এ অবস্থায় যদি সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে ঘুষের দরজাগুলোর বড় একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করল।' (আবু দাউদ)

ঘুষের কুফল

ঘুষ আদান-প্রদান নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। মানুষ যখন নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়, তখন সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। সেবা গ্রহীতা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেবা পান না। অনেক ক্ষেত্রে সেবা পেতে বিলম্ব হয়। মানুষ হয়রানির শিকার হয়। পৃথিবীর সব সমাজ ও দেশেই ঘুষ আদান-প্রদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ঘুষদাতা বা গ্রহীতা ধরা পড়লে শাস্তি পায়। ইসলামি শরিয়তে ঘুষ আদান-প্রদান হারাম ও কবিরা গুনাহ। কেউ যদি ঘুষ

আদান-প্রদানকে জায়েয মনে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদকে আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘুষ আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট আদেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। মানুষের ধন সম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকের নিকট (ঘুষ হিসেবে) পেশ করিও না'। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮)

ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা সাময়িক ভোগ-বিলাস করা সম্ভব হলেও এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ঘুষখোর ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা করে। আখিরাতেও তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় প্রলোভনের কারণে অনেকেই এই ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে যায়। সহজেই অর্থ উপার্জনের নেশায় যেন তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা থেকে বঞ্চিত না হয়, তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, (হে আল্লাহর রাসুল!) আপনি বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র (সম্পদ) সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। কাজেই হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১০০)

ঘুষ আদান-প্রদানকারী উভয়েই অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে। অনেক মানুষ তাদের কারণে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত মানুষ ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে অভিশাপ দেয়। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-ও তাদের অভিসম্পাত করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ

অর্থ: ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপরই আল্লাহর অভিশাপ। (মুসনাদে আহমাদ)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَا هُمَا فِي النَّارِ

অর্থ: ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি। (তাবারানি)

হাদিসে আরো এসেছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ

অর্থ: ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই রাসুলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ করেছেন। (তিরমিযি)

অনেক সময় অনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দায়িত্ব পালনকালে অতিরিক্ত উপহার গ্রহণ করলে, তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইবনুল লুতবিয়া নামের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। সে যাকাত আদায় করে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনাদের যাকাতের সম্পদ, আর এগুলো আমাকে উপহার

দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, আমার কর্মচারীর কী হলো! সে আমাকে বলে, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। সে তার মাতা-পিতার ঘরে বসে থাকল না কেন? তখন সে দেখত পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? আল্লাহর কসম, তোমাদের মাঝে কেউ অন্যায়ভাবে কোনো কিছু আত্মসাৎ করলে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। তখন তার আত্মসাৎকৃত সম্পদ উট হলে সে তার (উটের) আওয়াজ করবে, আর গরু হলে গরুর আওয়াজ করবে আর বকরি হলে বকরির আওয়াজ করতে থাকবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর দুই হাত এতটুকু উপরে উঠালেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলার কাছে কেউ মাফ চাইলে, মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু তিনি বান্দার হক মাফ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত যার হক নষ্ট করা হয়েছে সে মাফ করে না দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাকে মাফ না করে।

ঘুষখোর ব্যক্তি অন্যের অধিকার হরণ করে, ফলে সবাই তাকে ঘৃণা করে। এভাবে সমাজে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় ও শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। ঘুষের বিপরীত হচ্ছে উপহার। হীন উদ্দেশ্য ব্যতীত ভালোবেসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর সন্তুষ্টির জন্য একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার নাম উপহার। উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উপহার আদান-প্রদান করতে উৎসাহিত করেছেন। আমরা ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান থেকে বিরত থাকব। সুন্দর ও সুশৃঙ্খলিত সমাজ গড়ে তুলব।

মাদকাসক্তি

মাদকদ্রব্য মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়, নেশার উন্মেষ তৈরি করে এবং চিন্তা শক্তিকে লোপ করে দেয়। সাধারণত বিশেষ খাদ্যবস্তু ও পানীয় পানের মাধ্যমে মানুষ নেশা করে। নেশা মানুষকে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে দেয় না। তাই মাদককে হারাম করা হয়েছে। মাদকাসক্তি খুবই জঘন্য ও ঘৃণ্য বদঅভ্যাস। সকল প্রকার মাদক দ্রব্য ইসলামে নিষিদ্ধ। মাদককে আরবিতে 'খমর' বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ: হে মু'মিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো অপবিত্র এবং শয়তানের কর্ম। তোমরা তা ত্যাগ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আল মায়েদা, আয়াত: ৯০)

সকল বদঅভ্যাস ত্যাগ করা গেলেও মাদকাসক্তি সহজে ত্যাগ করা যায় না। মাদক মানুষের জ্ঞানকে বিলোপ করে। সামান্য পরিমাণে মাদক গ্রহণও হারাম। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে সকল দ্রব্যে অধিক পরিমাণ নেশা হয়, সে সকল জিনিস অল্প পরিমাণও হারাম'। (তিরমিযি)

নেশাজাত দ্রব্যাদির মাঝে অন্যতম হচ্ছে মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, আফিম, হেরোইন, মারিজুয়ানা, এলএসডি, কোকেন, মরফিন, ভাং, তাড়ি, কোডিন ট্যাবলেট, রেক্টিফাইড স্পিরিট, বুপ্রেরনফিন, অ্যালকোহল ইত্যাদি। নেশার উদ্দেশ্যে এই সকল বস্তু সেবন কিংবা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

মাদকাসক্তি অসংখ্য পাপ কাজের উৎস। মাদকাসক্তির ফলে মানুষ হত্যা, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঝগড়া- ফাসাদসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। মাদকাসক্তি সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ‘মদ্যপান সকল অশ্লীলতা ও কবিরা গুনাহের উৎস’।

মাদকাসক্তির ফলে আল্লাহর নিকট ইবাদাত কবুল হয় না। এছাড়াও মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’আলা অপছন্দ করেন। মাদকাসক্তি মানুষকে যিকির, খোদাভীরুতা ও ইবাদাত থেকে দূরে রাখে। প্রিয় রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৃত্যুর পর মূর্তিপূজারির মতো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে’। (মুসনাদে আহমদ)

মাদকাসক্তির পাশাপাশি মানুষের আরেকটি বদঅভ্যাস হচ্ছে ধূমপান। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ও তামাকজাত দ্রব্য দিয়ে ধূমপান করা হয়। ইসলামে ধূমপানও নিষিদ্ধ। ধূমপানের ফলে মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হয়। দুর্গন্ধযুক্ত মুখে মসজিদে গমন নিষেধ। দুর্গন্ধের ফলে অপরাপর মুসল্লিদের সমস্যা হয়। মহানবি (সা.) মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন।

ধূমপানের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। তামাকে থাকা নিকোটিন একটি বিষাক্ত দ্রব্য। ধূমপানের সংস্পর্শে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুদের বেশি শারীরিক ক্ষতি হয়। ধূমপানের মাধ্যমেই কিশোররা অপরাপর মাদকাসক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি অর্থের অপচয়ও ঘটায়। অর্থের যোগানের জন্য সমাজে এরা বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। পারিবারিক কলহ তৈরি করে। মাতা-পিতার সঙ্গে অসদাচরণ করে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তা’আলা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই’। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৭)

আর্থিক অপচয় ছাড়াও মাদকাসক্তি ও ধূমপানে স্বাস্থ্যহানি সবচেয়ে বেশি হয়। এর ফলে লিভারের সমস্যা, হেপাটাইটিস, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুস ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনির সমস্যা, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা, গ্যাস্ট্রিক, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন কমে যাওয়া, স্বাদ কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্যান্সার, স্নায়ুর ক্ষতিসহ জটিল ও দুরারোগ্য রোগ হয়। অনেক সময় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে হালাল হারামের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা সকলকে হালাল খাবার গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পুষ্টিকর সকল ধরনের খাবারকে হালাল আর ক্ষতিকর সকল বস্তুকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা উত্তম ও হালাল জিনিস ভক্ষণ করো যা আমি তোমাদের রিযিক হিসেবে দান করেছি।’ (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৭২)

অতএব আমরা মাদকাসক্ত না হয়ে সুন্দর স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করব।

অশ্লীলতা

আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্রের মধ্যে অশ্লীলতা প্রথম সারিতে। অশ্লীলতা হলো লজ্জাহীন আচরণ। লজ্জা মানুষকে সকল অনিষ্ট থেকে বিরত রাখে। লজ্জা বা শালীনতা হচ্ছে ইমানের একটি বিশেষ অঙ্গ। একজন মুসলমানের অন্তর সর্বদা পরিশুদ্ধ থাকতে হয়। অন্তর পরিশুদ্ধ করতে প্রয়োজন শালীনতা ও পবিত্র মানসিকতা। অশ্লীলতায় লিপ্ত থেকে এটি কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। আর অশ্লীলতা এতই জঘন্য অপবিত্র যে আল্লাহ তা'আলা এর নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছেন। কেননা, অশ্লীলতা অন্য সকল পাপের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ

অর্থ: প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেয়ো না। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫১) বর্তমানে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অশ্লীলতাকে বিভিন্নভাবে চাকচিক্যময় করে আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। ইসলামি জ্ঞান না থাকার কারণে, নিজের অজান্তেই আমরা তা গ্রহণ করছি এবং প্রচার-প্রসার করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা চায় মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।' (সূরা আন-নূর, আয়াত :১৯)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির সেরা প্রাণি হিসেবে মানুষ শালীন হবে এটাই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। শয়তান মানুষকে অশালীন আচরণ করতে আদেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সে তো এ নির্দেশ দেবে যে তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাকো এবং আল্লাহর প্রতি সে বিষয় মিথ্যারোপ করো যা তোমরা জানো না।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৯)

একজন দুশ্চরিত্র মানুষ স্বভাব, কথা-কাজ, সমস্ত কিছুতেই অশ্লীলতার ছাপ রেখে যায়। মানুষ ও সমাজের সঙ্গে তার আচরণ রূঢ় হয়। প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন, 'মু'মিন কখনো খোঁটাদানকারী, অভিশাপকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না।' (তিরমিযি)

একজন অশালীন ব্যক্তি কখনোই সমাজের সুশৃঙ্খল ও সুন্দর নিয়ম পছন্দ করবে না। সে অশ্লীলতা পছন্দ করবে। কারণ, তার অন্তর মৃত। সে শালীনতার সৌন্দর্য ও সুখ অনুধাবন করতে ব্যর্থ। আমরা সব সময় শালীনতার চর্চা করব। সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকব।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
'আখলাকে যামিমাহ (পরশ্রীকাতরতা, অপবাদ, ঘুষ, মাদকাসক্তি ও অশ্লীলতা) আমাদের সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে' (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি ২০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো এবং পরবর্তীতে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন (উপস্থিত বক্তৃতা) করবে।)

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবন চরিত

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা পূর্বের শ্রেণিতে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)সহ কয়েকজন নবি-রাসুল এবং মুসলিম মনীষীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে জেনেছি। তাঁদের জীবনাদর্শ আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে অনুশীলন করতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম, নবুওয়াত লাভ, মক্কায় ইসলাম প্রচার, মি'রাজ গমন এবং মদিনায় হিজরত পর্যন্ত জীবনচরিত সম্পর্কে জেনেছি। অষ্টম শ্রেণিতে মদিনায় ইসলাম প্রচার, মদিনা রাষ্ট্র গঠন, আত্মরক্ষায় বদর, ওহুদ, খন্দকসহ বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ও এর তাৎপর্যসহ আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা খায়বর বিজয়, মুতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধ, তাবুক অভিযান ও বিদায় হজ সম্পর্কে জানব।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

'যার জীবনাদর্শে আমি অনুপ্রাণিত হই'

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমার পছন্দের ব্যক্তির গুণাবলি তুমি যেভাবে অনুসরণ করো তা নির্ধারিত ছকে পূরণ করে উপস্থাপন করবে। এ কাজটির জন্য তোমার দেখা বা জানা ব্যক্তি নির্বাচন করবে। সেক্ষেত্রে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে তোমার পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/সহপাঠী/শিক্ষক প্রমুখ)।)

প্রিয় ব্যক্তি	পছন্দের গুণাবলি	যেভাবে অনুসরণ করি
নাজমা (আমার মা)	১। সত্যবাদিতা ২। ৩।	১। দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্য কথা বলি। ২। ৩।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

(মক্কা বিজয় থেকে ওফাত পর্যন্ত)

জোড়ায় কাজ
‘হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনীর স্মৃতিচারণ’
উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে পূর্বের শ্রেণিতে পঠিত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে তুমি কী কী জেনেছো তা তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

খায়বর বিজয়

খায়বার মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরের একটি বসতির নাম। মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মদিনা থেকে বহিষ্কৃত ইহুদিরা খায়বর নামক স্থানে বসবাস করছিল। বহিষ্কারের পরও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। তারা মহানবি (সা.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। তারা বনু গাতফান ও বেদুইনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এমনকি মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য তারা চার হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে। মহানবি (সা.) তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সপ্তম হিজরিতে ১৬০০ জন সৈন্য নিয়ে খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। পরাজয়ের পরও মহানবি (সা.) তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে নিরাপত্তা কর প্রদানের বিনিময়ে তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা প্রদান করলেন। বিজিত অঞ্চলে মহত্ত্বের এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

মুতার যুদ্ধ

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সামন্তরাজ শুরাহবিল সিরিয়া সীমান্তে মুতা নামক স্থানে একজন মুসলিম রাজদূতকে হত্যা করে। বাধ্য হয়ে মহানবি (সা.) যায়েদ বিন হারেসের নেতৃত্বে ৩০০০ মুসলিম সৈন্যের একটি দল মুতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুতা নামক স্থানে মুসলিম সৈন্যরা লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের মুখোমুখি হয়। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরপর তিনজন সেনাপতি যায়েদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ শহিদ হন। এরপর মহাবীর খালিদ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণের কৌশল অবলম্বন করেন। ইতোমধ্যে মহানবি (সা.) প্রেরিত সাহায্যকারী একটি সেনাদল মুতায় এসে পৌঁছে। এরপর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদের ওপর আঘাত হানে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। মহানবি (সা.) এ যুদ্ধে সাহসী নেতৃত্বের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করেন।

মক্কা বিজয়

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে খুজা'আ সম্প্রদায় মহানবি (সা.)-এর সঙ্গে এবং বনু বকর সম্প্রদায় কুরাইশদের পক্ষে যোগদান করেছিল। কিন্তু সন্ধির দুই বছরের মধ্যেই কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। বনু বকর সম্প্রদায় কুরাইশদের সহায়তায় খুজা'আ সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে কয়েকজনকে হত্যা করে। মহানবি (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি প্রথমে কুরাইশদের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে-

১. হয় তোমরা খুজা'আ সম্প্রদায়কে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাও।
২. না হয়, বনু বকর গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো।
৩. না হয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করো।

কুরাইশরা শেষোক্ত প্রস্তাব মেনে হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করে। ফলে মহানবি (সা.) ১০ হাজার সাহাবি নিয়ে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা অভিযানে রওনা দেন। মুসলিম বাহিনী মক্কার অদূরে মার-উজ-জাহরান গিরি উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান দুজন সঙ্গী নিয়ে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য মক্কার বাইরে আসে। এ সময় হযরত উমর ফারুক (রা.) আবু সুফিয়ানকে বন্দি করে মহানবি (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসেন। মহানবি (সা.) তাঁর দীর্ঘদিনের শত্রুকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েও ক্ষমা করে দিলেন। মহানবি (সা.)-এর এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়কালে মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে হাকিম ইব্‌ন হিযামের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে অবস্থান করবে, সেও নিরাপদ, যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ।'

কোনো রক্তপাত না ঘটিয়ে সামান্য বাধা অতিক্রম করে মহানবি (সা.) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। বিজয়ের প্রাক্কালে মহানবি (সা.) সাহাবিগণের উদ্দেশে বলেন, মক্কার পশু-পাখি হত্যা করা যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, ঘাস বা কোনো গাছ উপড়ে ফেলা যাবে না এবং অনুমতি ব্যতিরেকে কারো পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিতে পারবে না।

এরপর মহানবি (সা.) অতীত অত্যাচার-নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়ে মক্কাবাসীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা যেতে পারো; তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন।

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মক্কা বিজয়ের ফলে সমগ্র আরবে ইসলামের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এ বিজয়ের ফলে আরবের বেদুইন গোত্রগুলো ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করে।

মক্কা বিজয় ছিল রক্তপাতহীন অতুলনীয় একটি বিজয়। মক্কার কাফিরদের নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে মুসলমানরা এক সময় মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ে তারা অতীতের সকল অন্যায়-অত্যাচার

ও কষ্ট ভুলে গিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় কোনো হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ, নারী-শিশু নির্যাতন কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি জবরদস্তিমূলক আচরণ সংঘটিত হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম রক্তপাতহীন বিজয়ের কোনো তুলনা নেই। এ বিজয়ের পর মক্কাবাসীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মহানবি (সা.) অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মক্কা বিজয়ের ফলে বায়তুল্লাহর পবিত্রতা পুনরায় ফিরে আসে। পবিত্র কাবাগৃহে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। এ সময় মহানবি (সা.) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন–

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

অর্থ: 'সত্য সমাগত, আর মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য।' (বনী ইসরাইল, আয়াত: ৮১)

এরপর হযরত বেলাল (রা.)-এর আযানের পর মহানবি (সা.) সমবেত মুসলমানদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। এভাবে কাবাগৃহ থেকে চিরতরে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটল।

হুনায়নের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটলেও কয়েকটি সম্প্রদায় তখনও ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে। তাদের মধ্যে মক্কার হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বেদুইনরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হুনায়ন নামক স্থানে সমবেত হয়। মহানবি (সা.) এ খবর জানতে পেরে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলিম সৈন্যরা সংকীর্ণ পার্বত্য পথ অতিক্রমকালে সেখানে ওত পেতে থাকা বেদুইন সৈন্যরা তীর বর্ষণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মহানবি (সা.)-এর আহ্বানে মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় একত্রিত হয়ে বীরবিক্রমে শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন। মহান আল্লাহ এ যুদ্ধে ফেরেশতাগণের দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। ফলে মুসলিম সৈন্যরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। বিপুল পরিমাণ গবাদি পশু, স্বর্ণ-রৌপ্য ও যুদ্ধ উপকরণ মুসলমানদের হস্তগত হয়। এছাড়া ৬০০০ শত্রু সেনাকে বন্দি করা হয়।

এ যুদ্ধে পরাজিত বিধর্মীরা তায়িফ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম সৈন্যরা তায়িফ দুর্গ অবরোধ করেন। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর তায়িফবাসী আত্মসমর্পণ করে। মহানবি (সা.) তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে উদারতা ও মহানুভবতার আচরণ করলেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। মহানবি (সা.)-এর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তায়িফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হুনায়ুনের যুদ্ধের তাৎপর্য

হুনায়নের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা। এ যুদ্ধে নিজেদের সংখ্যাধিক্যে মুসলমানরা গর্বিত হয়ে পড়ে এবং শত্রু পক্ষকে অবজ্ঞা করতে থাকে। ফলে শত্রুপক্ষের অতর্কিত হামলায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরাজয়ের মুখে মহান আল্লাহর সাহায্য এবং মহানবি (সা.)-এর দৃঢ় নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ ফেরেশতা নাযিল করে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অসংখ্য ক্ষেত্রে এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিন। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং অনেক বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। এরপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং এমন এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন এবং এটাই কাফিরদের কর্মফল।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ২৫-২৬)

হুনায়নের যুদ্ধের গুরুত্ব

হুনায়নের যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের এক অজেয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বিপুলসংখ্যক অমুসলিম মহানবি (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকারে আগ্রহী হলো। ইসলামের চিরশত্রু বনু বকর ও বনু হাওয়াযিন গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করল। এতে মহানবি (সা.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এ সময় হতেই মদিনার প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। মদিনার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হয় এবং এটি একটি আন্তর্জাতিক নগরীর মর্যাদা লাভ করে।

তাবুক অভিযান

তাবুক অভিযান নবম হিজরির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বে মক্কা, তায়িফ ও হুনায়নে ইসলামের বিজয় সূচিত হলে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। মুতার যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা পরাজিত হলে তার ঈর্ষা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া আরব ইহুদিদের উস্কানি রোম সম্রাটের প্রতিশোধস্পৃহাকে তীব্রতর করে তোলে। ফলে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়।

হিরাক্লিয়াসের অভিযানের কথা জানতে পেরে সে বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য মহানবি (সা.) ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুক অভিমুখে রওনা দেন। রোমান সৈনিকরা মুসলমানদের ব্যাপক প্রতিরোধ আয়োজনের সংবাদ পেয়ে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবি (সা.) কয়েক দিন সেখানে অপেক্ষা করে মদিনায় ফিরে এলেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপ ও অসহ্য পানির কষ্টের মধ্য দিয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল বলে ইতিহাসে তা 'গাজওয়াতুল উসরা' বা কষ্টের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

তাবুক অভিযানের পর ওমান, নাজরান, ইয়েমেন, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এসে মহানবি (সা.) -এর আনুগত্য প্রকাশ করে। বনু তামিম, মুস্তালিক, কিনদা, আযদ, তায়ি প্রভৃতি গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

বিদায় হজ

দশম হিজরিতে মহানবি (সা.) হজ পালনের ইচ্ছা করলেন। তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। এজন্যই এই হজকে ‘বিদায় হজ’ বলা হয়। মহানবি (সা.) হজের কার্যক্রম সমাপ্ত করে আরাফার ময়দানে ‘জাবালে রহমত’ নামক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সমবেত মুসলমানরদের লক্ষ্য করে এক যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি একটি আদর্শ মুসলিম সমাজের চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেন। প্রাচীন রীতি-নীতি, সুদ প্রথা, শোষণ-নির্যাতন, নারীদের প্রতি অবিচার প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এটি মানবতার ইতিহাসে এক অনন্য ভাষণ।

মহানবি (সা.) তাঁর ভাষণের শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর মানবমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। জানি না, হয়তো আমি এ বছরের পর এখানে আর কখনো তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারব না। হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এই দিন ও এই মাসের মতো পবিত্র, তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। স্মরণ রেখো, তোমাদের একদিন আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে এবং তিনি তোমাদের কাজের হিসাব চাইবেন।

সাবধান, ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

হে মানবমণ্ডলী! স্মরণ রেখো তোমাদের আল্লাহ এক, তোমাদের পিতা এক। সাবধান! কোনো আরবের ওপর অনারবের যেমন প্রাধান্য নেই, তেমনি অনারবের ওপর আরবের কোনো প্রাধান্য নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর যেমন কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গেরও কোনো প্রাধান্য নেই। পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র খোদাভীতি বা সৎকর্ম।

হে আমার অনুসারীরা, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের সেরূপ অধিকার রয়েছে। তোমরা স্বীয় পত্নীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং তাঁরই আদেশ মতো তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ।

দাসদাসীদের প্রতি সর্বদা সদয় ব্যবহার করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তা-ই খাওয়াবে, যা পরবে, তাই পরাবে। যদি তারা কোনো অন্যায় করে এবং তা যদি তোমাদের নিকট অমার্জনীয় হয়, তবে তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করো। কিন্তু তাদের সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করো না। কারণ, তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদের মতোই মানুষ। অন্ধকার যুগের সকল রক্ত (রক্তের প্রতিশোধ) বাতিল করা হলো। আর সর্বপ্রথমে আমি আমার বংশের রাবিয়া ইবনে হারিসের রক্তের প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করলাম। অন্ধকার যুগের সকল সুদ বাতিল করা হলো। সবার আগে আমার গোত্রের আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সকল সুদ আজ আমিই রহিত করে দিলাম।

হে মানবমণ্ডলী! আমার কথা শ্রবণ করো এবং তা বুঝার চেষ্টা কর। জেনে রাখো, সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। তোমরা একই ভ্রাতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো কোনো কিছু জোর করে নিতে পারবে না।

তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কালাম কুরআন এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাত হাদিস রেখে যাচ্ছি। যত দিন তোমরা এগুলোর অনুশীলন করবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদাত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং আমি যা নির্দেশ দিয়েছি তা পালন করতে থাকবে। এর দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরপর মহানবি (সা.) আকাশপানে তাকিয়ে বললেন, ‘হে প্রভু! আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি? জনতা সমবেত কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ, আপনি আমাদের নিকট সব কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো’।

এ সময় তাঁর নিকট ওহি নাযিল হলো: ‘আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি‘আমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।’ (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩)

অতঃপর তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আমার এ বাণী আজ যারা উপস্থিত আছ তারা, যারা উপস্থিত নেই, তাদের নিকট পৌঁছে দেবে। উপস্থিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনুপস্থিত লোকেরাই আমার উপদেশ অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হবে।’

এরপর কিছু সময় নীরব থেকে জনতার দিকে তাকিয়ে মহানবি (সা.) বললেন, ‘বিদায়’।

মহানবি (সা.)–এর ওফাত

বিদায় হজের পর মহানবি (সা.) মদিনায় ফিরে যান। কিছুদিন পর আকস্মিকভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমেই তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিন তিনি সাহাবিদের একত্র করে বললেন, হে বন্ধুগণ! আমি যদি কখনো কারো ওপর আঘাত করে থাকি, তবে সে যেন আজ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আমি যদি কারো সম্মান লাঘব করে থাকি, তবে সে যেন আজ আমার প্রতি তদ্রূপ আচরণ করে। আর আমি যদি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকি, তবে সে যেন আজ আমার সম্পদ থেকে তা নিয়ে নেয়। সে যেন মনে না করে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হব; কারণ, আমার প্রকৃতি এটা হতে মুক্ত।

এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তিনটি দিরহাম দাবি করল। তিনি তখনই তা পরিশোধ করে দিলেন। এছাড়াও মহানবি (সা.) অসুস্থতার শেষ দিনগুলোয় নামায এবং দাস-দাসীদের সঙ্গে সদাচরণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের সালাত, যাকাত ও দাস-দাসীদের সম্পর্কে তোমাদের ওসিয়ত করছি। (মুসনাদে আহমাদ)

মহানবি (সা.)-এর অসুস্থতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইন্তিকালের আগে তিনি একাধিকবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর জ্বরের প্রকোপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্বরের প্রচণ্ডতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর গায়ে হাত রাখা যাচ্ছিল না। এ সময় অস্থিরতা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সমগ্র মদিনা নগরীকে গ্রাস করেছিল। সাহাবিগণ অশ্রুসজল নয়নে এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর ঘরের চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন। সবাই উদ্বিগ্ন, অস্থির ও ভগ্ন হৃদয়ে প্রিয় নবির (সা.) খোঁজ নিচ্ছিলেন এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলেন।

ওফাতের দিন তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সময় যতো গড়াতে থাকে তিনি ঘন ঘন বেহুঁশ হতে থাকেন। মহানবি (সা.)-এর একমাত্র কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) পিতার শয্যার পাশে বসা ছিলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। মহানবি (সা.) তাঁকে কাছে ডেকে কানে কানে কথা বললেন। তাঁর কথা শেষ হলে ফাতিমা (রা.)-এর দু'চোখ বেয়ে ঝরনার মতো অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। মহানবি (সা.) তাঁকে পুনরায় ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বললেন। এবার ফাতিমা (রা.) হাসিমুখে মাথা উঠালেন। একই সময় হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিপরীতধর্মী দু'রকম আচরণ দেখে উপস্থিত সাহাবিগণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

মহানবি (সা.)-এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা.) একই সঙ্গে কান্না ও হাসির কারণ সম্পর্কে বলেন, আমার পিতা প্রথমে তাঁর ইন্তিকালের কথা জানান। এ কারণে আমার তখন কান্না পেয়েছিল। তবে পরে তিনি আমাকে বললেন, তুমিই প্রথম, যে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। এ সংবাদ আমাকে আনন্দিত করল এবং আমিও বুঝতে পারলাম, অল্প কিছুদিন পরেই আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।

বেশ কিছুদিনের শারীরিক অসুস্থতার পর ১১ হিজরি ১২ রবিউল আওয়াল, সোমবার ৬৩ বছর বয়সে বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর তিরোধানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানবের গৌরবময় পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর পবিত্র দেহ একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহানবি (সা.)-এর ওফাতের সংবাদ সমগ্র মদিনা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবিগণ নির্বাক হয়ে পড়েন। এভাবেই অনেক সময় কেটে যায়।

অনেক সাহাবি মহানবি (সা.)-এর মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা পাগলপ্রায় হয়ে গেলেন। এই সংবাদে ওমর (রা.) অতিমাত্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতাকে বলতে লাগলেন, 'মুহাম্মাদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি, মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। যে বলবে তিনি মারা গেছেন, আমি তার গর্দান নেব।' ঠিক এই সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) এলেন। রাসুল (সা.)-এর মুখাবরণ তুলে ভক্তিভরে ললাটে বার বার চুমু দিতে লাগলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, 'জীবনে যেমন সুন্দর ছিলেন, মরণেও আপনি ঠিক তেমনি সুন্দর।

এরপর তিনি ওমরকে বললেন, হে ওমর! ক্ষান্ত হও। রাসুলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (আলে-ইমরান, আয়াত: ১৮৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 'মুহাম্মাদ একজন রাসুল মাত্র; তাঁর পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়েছেন। সুতরাং তিনি

যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?' (আলে-ইমরান, আয়াত: ১৪৪) 'অতএব হে লোক সকল! জেনে নাও, মুহাম্মাদ (সা.) মারা গেছেন। একমাত্র আল্লাহর মৃত্যু নেই, তিনি চিরঞ্জীব।' আবু বকর (রা.)-এর এই বক্তব্য শুনে উমর (রা.)-এর জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল এবং তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। সাহাবিগণ নিশ্চিত হলেন, মহানবি (সা.) ইন্তিকাল করেছেন। এ সংবাদে সকলেরই মুখ মলিন হয়ে পড়ে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। মদিনার সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর তাঁরা প্রিয় নবি (সা.)-কে শেষ দেখা ও তাঁর প্রতি সালাত, সালাম ও দোয়া পেশ করতে থাকলেন। মহানবি (সা.) যে কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ হলো ধৈর্য, ত্যাগ এবং সহমর্মিতার অন্যতম নিদর্শন'
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ তুমি বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করবে তার একটি কর্মপরিকল্পনা করো)।

হযরত মুসা (আ.)

জোড়ায় কাজ
'হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত আলি (রা.)-এর জীবনাদর্শ হলো আল্লাহর অনুগত্যে পরিপূর্ণ'
উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত আলি (রা.)-এর জীবনাদর্শ কোন দিকগুলোতে আল্লাহর অনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে খুঁজে বের করো।

পেন্টাটিউক প্রাচীন মিসরের রাজধানী, নীল নদের তীরের একটি নগরী। এই নগরীর শেষ প্রান্তে বসবাস করত বনি ইসরাইল বংশের লোকেরা। নগরীর সম্রাটদের 'ফির'আউন' বলা হতো। মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফির'আউনের নাম ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুসআব। তাকে 'দ্বিতীয় রামেসিস'ও বলা হয়। সে বনি ইসরাইল বংশের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কারণ, ফির'আউন একবার স্বপ্নে দেখে যে, 'বায়তুল মুকাদ্দাস' থেকে একঝলক আগুন এসে মিসরকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং তার অনুসারী 'কিবতি' সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনি ইসরাইলদের কোনো ক্ষতি করছে না। ফির'আউন তার রাজ্যের সকল স্বপ্নবিশারদ থেকে একসঙ্গে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চায়। তারা বলল, ইসরাইল বংশে এমন এক পুত্রসন্তানের আগমন হবে, যে আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে ধ্বংস করে দেবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফির'আউন ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ফির'আউন সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল যে, বনি ইসরাইল বংশে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সবাইকে যেন হত্যা করা

হয়। তাই সে সময় ফির'আউনের সেনাবাহিনীরা ঘুরে বেড়াত। কেউ জন্মগ্রহণ করলেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করত। এভাবে অসংখ্য ইসরাইলি পুত্রসন্তান নিহত হয়।

হযরত মুসা (আ.)-এর জন্ম

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পিতা ইমরান আর মা ইউকাবাদের ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন শিশু মুসা (আ.)। জন্মের পরপরই তাঁর মা খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। শিশুসন্তানকে বাঁচাতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন। হযরত মুসা (আ.)-কে তাঁর মা তিন মাস গোপনে লালন-পালন করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন একটি বাক্সে ভরে মুসা (আ.)-কে নদীতে ভাসিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কাঠের বাক্স বানিয়ে শিশু মুসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেন। সেই কাঠের বাক্স ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের প্রাসাদ ঘাটে গিয়ে ভিড়লো। কয়েকজন দাসী এসে তা তুলে নিয়ে ফির'আউন এবং তার স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুজাহিম-এর সামনে পেশ করল।

হযরত আসিয়া (রা.) বাক্সটা খোলার পর হযরত মুসা (আ.)-কে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি শিশুটিকে নিজের ছেলে হিসেবে রাখতে চাইলেন। কিন্তু বিপত্তি বাধাল ফির'আউন। সে তাকে হত্যা করতে চাইল। তার মনে প্রবল সন্দেহ হলো- এ শিশুটি বনী ইসরাইলের কেউ হবে। হতে পারে এই সে-ই, যার জন্য অসংখ্য শিশুকে সে হত্যা করেছে। কিন্তু হযরত আসিয়া (আ.) যুক্তি দিয়ে বললেন, 'সে হয়তো আমাদের চোখের শীতলতা হবে। তাঁকে হত্যা করবেন না। আমরা তাকে আমাদের সন্তানের মতো করে গড়ে নেব।' ফির'আউন তার কথা মেনে নিল।

হযরত মুসা (আ.)-এর শৈশবকাল

হযরত মুসা (আ.)-কে দুধপান করানো নিয়ে বেশ জটিলতায় পড়লেন আসিয়া (আ.)। ক'জন ধাত্রীকে আনা হলো, অথচ তিনি কারো স্তন্যপান করলেন না। এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন মুসা (আ.)-এর বোন মরিয়ম। সে বলল, 'আমি একজন ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি। সে অতি যত্নের সঙ্গে তাকে লালন করবে এবং আমি আশাবাদী সে তাঁর দুধ পান করবে।' এভাবেই মুসা (আ.) তাঁর মায়ের কোলেই রাজ প্রাসাদে লালিত-পালিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মায়ের অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন।

ফির'আউন শিশু মুসা (আ.)-কে কোলে নিলেন। তখন শিশু মুসা (আ.) ফির'আউনের গালে প্রচণ্ড জোরে চড় মারেন। এই ঘটনায় ফেরাউন বেশ চটে যায়। সে মুসা (আ.)-কে হত্যা করতে চাইল এবং বলল, এই সেই শিশু, যে আমার রাজত্ব ধ্বংস করবে। তখন আসিয়া (আ.) বুঝালেন, এটা নিতান্তই শিশুসুলভ আচরণ। আপনি তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আসিয়া (আ.)-এর কথামতো পরীক্ষার আয়োজন করা হলো। এক পাত্রে মণিমুক্তা আরেক পাত্রে আগুনের অঙ্গার রাখা হলো। মুসা (আ.)-কে ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি মণিমুক্তার দিকে গেলেও জিবরাইল (আ.) তাঁকে অঙ্গারের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন আগুন মুখে নেওয়ায় তার মুখে জড়তা তৈরি হয়।

হযরত মুসা (আ.)-এর হিজরত

হযরত মুসা (আ.) একবার দেখতে পেলেন যে, একজন কিবতি জনৈক ইসরাইলিকে অত্যাচার করছে। তিনি অত্যাচারিত লোকটিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারী কিবতি লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। এতে লোকটি মারা যায়। হযরত মুসা (আ.) তখন প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে স্বদেশ ত্যাগ করলেন। তিনি যাত্রা শুরু করলেন মাদইয়ানের উদ্দেশ্যে।

তিনি মাদইয়ানের একটি মরুদ্যানে পৌছাতে সক্ষম হলেন। নিজের কর্মদক্ষতায় তিনি দু'জন অপেক্ষমাণ রমণীকে পানি সংগ্রহ করে দিলেন। তাদের মাধ্যমে হযরত মুসা (আ.) সাক্ষাৎ পেলেন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর। হযরত মুসা (আ.) তাঁর সান্নিধ্যে ১০ বছর অতিবাহিত করেন। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন।

নবুওয়াত লাভ

দীর্ঘ দশ বছর পর হযরত মুসা (আ.) মাদইয়ান থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও একপাল বকরি। তুর পাহাড়ের পাদদেশে আসার পর সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রিযাপনের জন্য তিনি পাহাড়ের নিকটে 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখানে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন অসংখ্য মু'জিযা। তার মধ্যে অন্যতম হলো হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া ও হাতের শুভ্রতা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর সঙ্গে সরাসরি ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতেন। আর এ কারণে তাঁকে 'কালিমুল্লাহ' তথা আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী বলা হয়।

দ্বীনের দাওয়াত

নবুওয়াত লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। হযরত মুসা (আ.) তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় ফির'আউনের রাজ প্রাসাদে কাটিয়েছেন। শৈশবে মুখ পুড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর মুখে জড়তা সৃষ্টি হয়। অথচ নবুওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বিশুদ্ধভাষী হওয়া জরুরি। তাই তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন!' আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং অতিসত্বর মিসরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। হযরত মুসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে নিয়ে ফির'আউনের কাছে যান এবং দ্বীনের দাওয়াত দেন।

হযরত মুসা (আ.) ফির'আউনকে তাঁর মু'জিযাগুলো দেখালেন এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইমান আনার আহ্বান জানালেন। ফির'আউন এতে কর্ণপাত করল না। উপরন্তু সে হযরত মুসা (আ.)-কে যাদুর চ্যালেঞ্জ দিল।

যাদুমঞ্চ ও যাদুকরদের ইমান গ্রহণ

বিশাল মাঠে যাদু দেখানোর আয়োজন করা হলো। অনেক বেশি লোকসমাগম হলো। দেশের সবচেয়ে দক্ষ যাদুকররা এলো। সেই বিশাল জনসভায় মুসা (আ.) দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'দুর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।' মুসা (আ.)-এর কথা শুনে তারা বিস্মিত হয়ে পরস্পর পরামর্শ করল। তারপর মুসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলল, তুমিই আগে শুরু করবে নাকি আমরা? তিনি বললেন, 'তোমরাই আগে শুরু করো। যাদুকররা তাদের লাঠি আর দড়ি জমিনে নিক্ষেপ করল। সেগুলো যাদুর প্রভাবে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করল। তখন আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ.)-কে অভয় দিয়ে বলেন, ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ করো। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৫-৭০) মুসা (আ.) যখন তাঁর লাঠি জমিনে নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিরাট অজগর হয়ে মাঠের সবগুলো সাপ গ্রাস করে ফেলল। যাদুকররা বুঝতে পারল, এ নিছক যাদু নয়। তারা সকলেই তখন সিজদায় অবনত হয়ে ইমান আনল।

ফির'আউনের পরিণতি

ফির'আউন যখন ইমান আনল না এবং বনি ইসরাইলকেও তার দাসত্ব হতে মুক্তি দিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ.)-কে মিসর ত্যাগ করার আদেশ দেন। রাতের অন্ধকারে মুসা (আ.) বনি ইসরাইলকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। ফির'আউন হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর দলবলের মিসর ত্যাগের খবর শুনে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁদের পেছনে ছুটল। হযরত মুসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে ফির'আউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাঁদের খুব কাছাকাছি চলে এলো। তখন মুসা (আ.)-এর অনুসারীরা ভয় পেয়ে গেল। মুসা (আ.) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আমার রব আমাদের পথ দেখাবেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) তাঁর লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করলেন। সাগরের পানিতে রাস্তা তৈরি হলো। বনি ইসরাইলের ১২টি দলের জন্য ১২টি পথ হয়ে গেল। হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করলেন। ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের সাগর পার হতে দেখে তাঁদের অনুসরণ করল। যখন তারা সাগরের মাঝখানে পৌঁছল, তখনি রাস্তা সাগরের পানিতে মিশে গেল। ফলে ফির'আউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হলো। আর এভাবে সত্যের জয় হলো।

তাওরাত লাভ

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-কে তাওরাত কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। তিনি আল্লাহর আদেশে তাওরাত কিতাব আনতে তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে ৩০ দিন থাকার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আরো ১০ দিন বেশি অবস্থান করলেন। তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ.) সাওম, ইতিকাফ ও কঠোর সাধনায়

মগ্ন থাকতেন। তিনি তুর পাহাড়ে থাকাকালীন তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুসারীদের অনেকেই 'সামেরি' নামক এক ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ে গরুর বাছুর পূজা শুরু করে। হযরত মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব নিয়ে এসে তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন। তখন তাওবা হিসেবে গরু বাছুর পূজারিদের একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যার ফলে সত্তর হাজার বনি ইসরাইল নিহত হয়। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) আল্লাহর নিকট খুব কান্নাকাটি করেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।

ইন্তিকাল

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। হযরত মুসা (আ.)-ও এর ব্যতিক্রম নন। হযরত মুসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সিনাই উপত্যতায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। আমরা হযরত মুসা (আ.)-এর মতো নির্ভীক হয়ে সত্যের পথে মানুষকে ডাকব। সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণের মধ্যেই জীবনের সাফল্য নিহিত।

হযরত আলি (রা.)

প্যানেল আলোচনা
'হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত আলি (রা.)-এর জীবনাদর্শ চর্চা'
উল্লিখিত মহামানবদের জীবনাদর্শ তোমার জীবনে কীভাবে অনুশীলন করবে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তা তোমার সহপাঠীর সাথে প্যানেল বা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

হযরত আলি (রা.) মহানবি (সা.)-এর জামাতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি আহলুল বায়ত বা নবি-পরিবারের অন্যতম সদস্য। তাঁর পিতা ছিলেন আবু তালিব, যিনি মহানবি (সা.)-এর আপন চাচা। তাঁর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ, যিনি মহানবি (সা.)-এর কাছেও মাতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হযরত আলি (রা.)-এর উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব। আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ), হায়দার (সিংহ), মুরতাজা (কবুলকৃত) , আমিরুল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের নেতা) ইত্যাদি তাঁর উপাধি।

জন্ম ও শৈশব

হযরত আলি (রা.) মহানবি (সা.)-এর ওহি লাভের ১০ বছর পূর্বে এবং হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে ৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাকিমসহ অনেক ঐতিহাসিকের মতে, তিনি কাবা শরিফের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি শৈশব থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং খাদিজা (রা.)-এর সংসারেই লালিতপালিত হন। তিনি সব সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গেই থাকতেন।

ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের সেবায় অবদান

হযরত আলি (রা.) বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যেহেতু রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ঘরে লালিতপালিত হয়েছেন, সেহেতু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কখনো মূর্তিপূজাসহ অনৈসলামিক কোনো কার্যকলাপে যুক্ত হননি।

মহানবি (সা.) তাঁর বাসায় কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবেত করে ইসলামের দাওয়াত দেন। আবু লাহাবের প্ররোচনায় তখন কুরাইশ নেতারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেননি। কিন্তু আলি (রা.) তখন দৃঢ় কণ্ঠে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর আনুগত্যের ঘোষণা দেন। হিজরতের রাতেও তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে তাঁরই বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন। জীবনের কঠিন ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রদত্ত আমানতের মালের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দেওয়া দায়িত্বের চেয়ে তিনি তাঁর জীবনের মূল্য তুচ্ছ মনে করেছেন। দায়িত্ব পালনেই ছিল তাঁর কাছে বড় ব্যাপার। কিছুদিন পর তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

বীরত্ব

আলি (রা.) বদর যুদ্ধসহ প্রতিটি যুদ্ধে মহানবি (সা.)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে যুলফিকার তলোয়ার উপহার দেন। সবগুলো যুদ্ধে তিনি পতাকা বহন করেছেন। শুধু তাবুক যুদ্ধে তিনি অংশ নিতে পারেননি। কারণ, এ সময় মহানবি (সা.) তাঁকে মদিনা নগরীর দায়িত্বভার দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খায়বার যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে পতাকা প্রদান করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি ঢাল হারিয়ে ফেললে কামুস দুর্গের অত্যন্ত ভারী একটি দরজাকে ঢাল বানিয়ে যুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে এই দরজা উঠাতে আটজন মানুষের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁর এই অলৌকিক কীর্তিতে মুসলিমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা 'আল্লাহর সিংহ' উপাধি দান করেন।

আলি (রা.) একজন কাতিবে ওহি তথা ওহি লেখক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও তিনি সন্ধিপত্র লেখার দায়িত্ব পালন করেন।

বিবাহ

হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে হযরত আলি (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। এই পবিত্র সংসারে হযরত হাসান, হোসাইন, মুহসিন, যয়নব ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই মুহসিন (রা.) ইন্তিকাল করেন।

পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি আনুগত্য ও সহায়তা

হযরত আলি (রা.) তাঁর পূর্বে খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-কে পেয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের খিলাফত আমলে তিনি তাঁদের প্রধান পরামর্শদাতার দায়িত্ব পালন করেন। উমর (রা.) এ জন্য বলেছিলেন, 'আলি না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত।' বিশেষ করে উসমান (রা.) শত্রুবেষ্টিত

হলে তাঁকে প্রতিরক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালান। এ কাজে তিনি হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.)-কেও নিযুক্ত করেছিলেন।

খিলাফতের দায়িত্বলাভ

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন খলিফা হযরত উসমান (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এর কয়েক দিন পর বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলি (রা.) চতুর্থ খলিফা হিসেবে খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করার পর উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার করা নিয়ে তিনি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সাহাবিগণের অনেকেই তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন। কিন্তু হত্যাকারীদের পরিচয় শনাক্ত করা না যাওয়ায় তাদের বিচার করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং ফলে রক্তক্ষয়ী উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরবর্তী সময়ে খারেজি নামক চরমপন্থীদের অভ্যুদয় ঘটে। তাদের বিরুদ্ধে হযরত আলি (রা.) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

জ্ঞানসাধনা

আরবে অল্প যে কয়েকজন মানুষ লেখাপড়া জানতেন, হযরত আলি (রা.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি ৫৮৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। মহানবি (সা.) বলেছেন,

أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

অর্থ: 'আমি প্রজ্ঞার ঘর আর আলি হলেন সে ঘরের দরজা।' (তিরমিযি)

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত আলি (রা.) জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, বিবেচনাবোধ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, পরহেযগারিতা, দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদির সমন্বয়ে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একবার এক ইহুদি তাঁর বর্ম চুরি করে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারায় তাঁরই নিযুক্ত বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেয়। তিনিও রায় মেনে নেন। পরবর্তী সময় ইসলামের এই ন্যায়বিচার দেখে সেই ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। সাধারণ মানের কাপড় পরতেন।

হযরত আলি (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা

হযরত আলি (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবির অন্যতম। হিজরতের পরে মহানবি (সা.) প্রত্যেক মুহাজির সাহাবির সঙ্গে একজন আনসার সাহাবিকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং নিজের জন্য আলি (রা.)-কে নির্বাচন করেছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-এর সঙ্গে হযরত হারুন (আ.)-এর যে সম্পর্ক, আলি (রা.)-এর সঙ্গেও তাঁর তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন,

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

অর্থ: 'আমি যার অভিভাবক, আলিও তাঁর অভিভাবক।' (তিরমিযি)

আরেকটি হাদিসে মহানবি (সা.) আলি (রা.)-কে বলেছেন, 'তুমি আমার এবং আমি তোমার।' (বুখারি)

হযরত আলি (রা.)-এর কয়েকটি উপদেশ

আলি (রা.) বলেছেন:

- ধন-সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। কারণ, ধন-সম্পদ তোমার পাহারা দিতে হয় আর জ্ঞান নিজেই তোমাকে পাহারা দেবে। সম্পদ বিতরণ করলে শেষ হয়ে যাবে আর জ্ঞান যতই বিতরণ করবে, ততই বাড়বে।
- তোমার শত্রু তিনজন: তোমার নিজের শত্রু, তোমার শত্রুর বন্ধু এবং তোমার বন্ধুর শত্রু।
- দানশীলতা সর্বোত্তম গুণ।

ইন্তিকাল

হযরত আলি (রা) ৪০ হিজরির ১৮ রমযান শুক্রবার ফজরের নামাযে যাবার পথে খারেজি দুর্বৃত্ত আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের বিষাক্ত খঞ্জরের আঘাতে আহত হন। এর তিনদিন পর ২১ রমযান তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত হাসান (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। এরপর কুফার জামে মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

হযরত আলি (রা.)-কে কেন আসাদুল্লাহ বলা হয়?

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। কাজটি করার জন্য তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, সহপাঠী, ধর্মীয়জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বা অনলাইন সোর্স এর সহায়তা নিতে পারো।)

হযরত হাসান (রা.)

হযরত হাসান ইবনে আলি (রা.) হলেন মহানবি (সা.)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র। তিনি আহলুল বায়ত বা নবি-পরিবারের অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহানবি (সা.) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। চার খলিফার পরে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ খলিফা।

জন্ম ও শৈশব

হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.) ও হযরত আলি (রা.)-এর ঘর আলোকিত করে ৩য় হিজরি মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে রমযান মাসে হযরত হাসান ইবনে আলি (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মে মহানবি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আলি (রা.)-এর কাছে এসে তিনি বললেন, 'আমার নাতিকে দেখাও। তাঁর নাম কী রেখেছো?' আলি (রা.) প্রথমে নাম রেখেছিলেন, 'হারব'। মহানবি (সা.) তাঁর 'হারব' নাম বদলে নাম রাখেন হাসান। তিনি নিজেই হাসান (রা.)-এর কানে আযান দেন এবং মেষ দিয়ে আকীকা করেন।

হযরত হাসান (রা.)-এর শৈশব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরম স্নেহ ও ভালোবাসায় অতিবাহিত হয়েছে। কখনো কখনো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিজদাহ দেওয়ার সময় তিনি ও তাঁর ছোট ভাই হোসাইন (রা.) এসে পিঠে চড়ে বসতেন। তাঁরা যেন বেশিক্ষণ পিঠে থাকতে পারেন, সেজন্য তিনি নামাযের সিজদাও দীর্ঘায়িত করতেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কখনো কখনো কোলে নিয়ে হাঁটতেন। হাসান-হোসাইন দুইভাই তাঁর কাছে দৌড়ে এলে তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন। একবার তাঁরা দুজনে লাল রঙের জামা পরে বের হলেন। কিন্তু তাঁরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। মহানবি (সা.) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি খুতবা বন্ধ রেখে দ্রুত নেমে এসে তাঁদেরকে উঠিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন।

আরেকবার মহানবি (সা.) হযরত হাসান (রা.)-কে কাঁধে উঠালেন। তখন একজন সাহাবি বললেন, 'হে বালক! তুমি কত উত্তম সওয়ারিতে আরোহণ করেছ।' এ কথা শুনে মহানবি (সা.) বললেন, 'আরোহী নিজেও তো কত উত্তম।' (তিরমিযি)

হযরত হাসান (রা.)- এর বয়স যখন সাত বছর, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

শিক্ষাদীক্ষা

হযরত হাসান (রা.) তাঁর নানা হযরত মুহাম্মাদ (সা.), পিতা আলি (রা.), মা খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা.) প্রমুখের কাছে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁর থেকে সালাতুল বিতরের দোয়াসহ বেশ কিছু হাদিসও বর্ণনা করেছেন। একবার হাসান (রা.) সদকা হিসেবে দেওয়া একটি খেজুর মুখে দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই সেই খেজুর তাঁর মুখ থেকে বের করে আনেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দেন, নবি-পরিবারের জন্য মানুষের দান-সদকা গ্রহণ করা বৈধ নয়। এভাবে মহানবি (সা.) নিজেই তাঁকে তালিম-তরবিয়ত শিক্ষা দেন।

হযরত হাসান (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা

অসংখ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসান (রা.)-এর মর্যাদা স্পষ্ট করেছেন। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) জান্নাতের যুবকদের সর্দার হবেন। তাঁরা দুনিয়াতে মহানবি (সা.)-এর দুটি ফুলস্বরূপ। হযরত হাসান (রা.)-এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

অর্থ: 'আল্লাহ! আমি হাসানকে ভালোবাসি। আপনিও হাসানকে ভালোবাসুন। আর যে হাসানকে ভালোবাসে, তাকেও আপনি ভালোবাসুন।' (বুখারি)

তাই হাসান (রা.)-কে ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা প্রাপ্তির অন্যতম উপায়।

বিশিষ্ট সাহাবিগণও ইমাম হাসান (রা.)-কে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর সওয়ারির রেকাব ঠিক করে দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) তাঁর কাছে বসলে অত্যন্ত শীতের রাতেও ঘেমে উঠতেন। বলতেন, 'তিনি ফাতিমার সন্তান!'

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর পরে খিলাফত চলবে ৩০ বছর। আলি (রা.)-এর শাহাদতের সময় খিলাফতে রাশেদার ২৯ বছর ৬ মাস পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর পরে ইমাম হাসান (রা.) খলিফা হিসেবে ৪০ হিজরির রমযান মাসে (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ছয় মাস খিলাফতের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। এরপর মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষার স্বার্থে আমিরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে সন্ধি করেন এবং শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত করেন। আসলে এটি ছিল মহানবি (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। তিনি হাসান (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমার এ দৌহিত্র সরদার হবে আর সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের দু'টি দলের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।'

চরিত্র ও দেহসৌষ্ঠব

ইমাম হাসান (রা.)-এর চেহারা ও শরীরের গঠন মহানবি (সা.)-এর পবিত্র শরীরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। একবার হযরত হাসান (রা.) শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁকে দেখে কাঁধে তুলে নিলেন। বললেন, 'আরে হাসান তো দেখতে মহানবি (সা.)-এর মতো, আলির মতো নয়।' আলি (রা.) একথা শুনে হেসে ফেললেন। আনাস (রা.) বলেছেন, 'হযরত হাসান রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।'

হযরত হাসান (রা.) অনেক বেশি ইবাদাত-বন্দেগি করতেন। ফজরের নামায পড়ার পর তিনি সব সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের স্থানেই বসে থাকতেন এবং যিকর-আযকার করতেন। তিনি মোট ১৫ বার পায়ে হেঁটে হজ করেছিলেন, কোনো বাহন ব্যবহার করেননি। তিনি একটি কবিতায় বলেছেন,

يَا أَهْلَ لَذَّاتِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا إِنَّ اغْتِرَارًا بِظِلٍّ زَائِلٍ حُمُقُ

অর্থ: ওহে দুনিয়ার ভোগী মানুষ। দুনিয়া তো স্থায়ী নয়, অপসৃয়মান ছায়ায় বিভ্রান্ত হওয়া তো নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।' (কিতাবুয যুহদ)

জীবনীকারগণ তাঁর মহান চরিত্রের বহু দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন: তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, দানশীল, ধৈর্যশীল, গভীর প্রজ্ঞাবান এবং দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আচরণে সবাই মুগ্ধ হতো। সর্বসাধারণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত।

একবার হযরত হাসান (রা.) একটি লোককে দোয়া করতে শুনলেন। সে আল্লাহর কাছে ১০ হাজার দিরহাম প্রার্থনা করেছিল। হাসান (রা.) তখনই বাসায় এসে ঐ লোকটিকে ১০ হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন।

আরেকবার তিনি একটি বাগানে গিয়ে দেখতে পেলেন, একজন দাস রুটি খাচ্ছে এবং নিজের রুটি থেকে একটি কুকুরকেও খেতে দিচ্ছে। তিনি বললেন, 'তুমি কুকুরটিকেও খাওয়াচ্ছ?' দাস বলল, 'ওকে রেখে আমার একা খেতে সংকোচ হচ্ছে।' তখন হাসান (রা.) বললেন, 'তুমি এখানেই থাকো। আমি না আসা পর্যন্ত যেয়ো না।' এরপর তিনি ঐ বাগানের মালিকের কাছে গিয়ে ঐ বাগান এবং দাসকে কিনে নিলেন। এরপর ফিরে এসে দাসকে মুক্ত করে দিয়ে বাগানটিও তাকে দান করলেন। সেই দাস অভিভূত হয়ে তখনই বাগানটিকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

আরেকবার হযরত হাসান ইবনে আলি (রা.) একটি খচ্চরে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একদল দরিদ্র মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। তারা মাটিতেই খাবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাচ্ছিল আর লোকদের কাছে ভিক্ষা করছিল। হযরত হাসানকে দেখে তারা বললো, 'হে রাসুলুল্লাহর সন্তান! আসুন আমাদের সঙ্গে নাশতা করুন।'

হযরত হাসান (রা.) তখনই বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং মাটিতে বসেই তাদের সঙ্গে মাটিতে ছড়ানো খাবার খেলেন। এরপর বললেন, 'তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। এবার আমার দাওয়াত কবুল করতে হবে।' এরপর একটি সময় তাদের সবাইকে তিনি ডাকলেন এবং অনেক মূল্যবান খাবারের ব্যবস্থা করলেন। এবারও তিনি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেলেন।

ইন্তিকাল

হযরত হাসান (রা.)-কে একদল অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী বিষ খাইয়েছিল। এই বিষক্রিয়ার প্রভাবে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় শাহাদত বরণ করেন। সেদিন মসজিদে নববিতে আবু হুরায়রা (রা.) কান্নারত অবস্থায় চিৎকার করে সমবেত জনতাকে বলেন, 'ওহে মানুষ! নবিজীর (সা.) প্রিয়তম ব্যক্তি আজ ইন্তিকাল করেছেন। তোমরা কাঁদো!' জানাযা শেষে হযরত হাসান (রা.)-কে জান্নাতুল বাকিতে তাঁর মা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।

হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.)

একক কাজ
'ইসলামে মহিয়সী নারী'
শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি মুসলিম মহিয়সী নারীদের একটি তালিকা করো।

যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিবর্গও এসেছেন যারা মহান আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁরা নবি-রাসুলগণের অনুসরণে মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন। এমনই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.)।

জন্ম ও পরিচয়

হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) ৯৯ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে বসরি বলা হয়। তাঁর পিতার নাম ইসমাঈল এবং মাতার নাম মায়ফুল। তাঁর পিতা খুব দরিদ্র ছিলেন। যেদিন রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ঐ দিন রাতে তার পিতার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর মতো তেলও ছিল না। চার বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ ছিলেন। তাই তাঁর নাম রাখা হলো রাবিয়া (চতুর্থ)। শৈশবে তাঁর পিতামাতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়।

শিক্ষাজীবন

হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) খুব অল্প বয়সেই মা-বাবার কাছ থেকে কুরআন, হাদিস, ফিকহশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তার কখনো কোনো সংকোচ ছিল না। তিনি দরিদ্র হলেও পরম ধার্মিক ও আল্লাহভক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ভদ্র, নম্র ও সংযমী। সেই সঙ্গে প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী। সব সময় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। রাগ, হিংসা, অহংকার তাঁর চরিত্রকে কখনো কলুষিত করতে পারেনি। মোটকথা আল্লাহর একজন প্রকৃত অলি হওয়ার জন্য যে গুণাবলি থাকা প্রয়োজন এর সব কিছুই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘ সাধনার পর রাবিয়া বসরি (রহ.) ইলমে তাসাউফ ও মারেফাতের সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে রাবিয়া একজন কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ক্রীতদাসীর জীবন

হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.)-এর মাতা-পিতার ইন্তিকালের পর তার বড় বোনেরা জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে অন্যত্র চলে যান। নিঃসঙ্গ রাবিয়া বসরি (রহ.) কান্নাকাটি করে কাটাতে লাগলেন দিনের পর দিন। হঠাৎ এক পাষণ্ড এসে জোর করে তুলে নিয়ে গেল রাবিয়া বসরি (রহ.)-কে। দাসী কেনাবেচার হাটে নিয়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল পাষাণহৃদয় এক ব্যক্তির নিকট। ক্রীতদাসীতে পরিণত হলেন রাবিয়া বসরি (রহ.)। তিনি দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। রাতের বেলায় জাগ্রত থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতেন। হঠাৎ এক মাঝরাতে তাঁর মনিবের ঘুম ভেঙে যায়। মনিব অস্পষ্ট কিছু কথার গুঞ্জন শুনতে পান। গভীর অন্ধকারে কার কথার শব্দ? খুঁজতে যেয়ে দেখতে পান রাবিয়া ইবাদাত করছে। আকুল স্বরে প্রার্থনা করছে প্রভুর দরবারে। একপর্যায়ে রাবিয়া মোনাজাত ধরে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কোনো মানুষের অধীন করে না রাখলে আমি সর্বক্ষণ শুধু তোমার ইবাদাত করতাম। রাবিয়ার আকুল প্রার্থনা শুনে মনিবের মন গলে যায়। মনিব মনে মনে বলল, হায়! এ আমি কাকে আমার ঘরে দাসী বানিয়ে রেখেছি? সে তো সামান্য নারী হতে পারে না। সে নিশ্চয় আল্লাহর প্রিয়জন। এ ঘটনার পরদিন সকালে মনিব রাবিয়া বসরি (রহ.)-কে দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করলেন। এবার রাবিয়া বসরি (রহ.) মুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করলেন প্রভুর ইবাদাতে। তিনি জীবনে বিয়ে করেননি। কেবল আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে কাটিয়ে দেন।

আল্লাহর ওপর আস্থা ও ইবাদাত

তাপসী রাবিয়া বসরি (রহ.) আল্লাহর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বসবাস করতেন। তবু কোনো মানুষের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। একবার হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) অসুস্থ হলে আব্দুল ওয়াহিদ আমর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরি তাঁকে দেখতে যান। তখন সুফিয়ান সাওরি হযরত রাবিয়া বসরি

(রহ.)-কে বললেন, যদি আপনি দোয়া করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। রাবিয়া বসরি (রহ.) বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আপনি কি জানেন না কার ইচ্ছায় আমার এ অসুস্থতা? যার ইচ্ছা, তিনি কি আল্লাহ তা'আলা নন? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ! রাবিয়া বসরি (রহ.) বললেন, তাহলে কেন আমাকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে বলছেন।

মালিক ইবনে দিনার একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি রাবিয়া বসরি (রহ.)-এর পরিচিত ছিলেন। তিনি একদা রাবিয়ার আর্থিক দুরবস্থা দেখে বললেন, আপনি বললে আমি আমার এক ধনী বন্ধু থেকে আপনার জন্য সাহায্য আনতে পারি। রাবিয়া বললেন, হে মালিক! আমাকে এবং আপনার বন্ধুকে কি আল্লাহই রিযিক দেন না? মালিক বলল, হ্যাঁ! রাবিয়া বললেন, আল্লাহ কি দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের কারণে ভুলে যাবেন এবং ধনীদের তাদের ধনসম্পদের কারণে মনে রাখবেন? মালিক বলল, না। তখন রাবিয়া বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমার অবস্থা জানেন, তখন তাকে আমার আবার স্মরণ করানোর দরকার কী? বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক আল জাহিজ বলেন, রাবিয়ার কয়েকজন পরিচিত লোক তাঁকে বললেন, আমরা যদি আপনার আত্মীয়স্বজনদের বলি তাহলে তারা আপনাকে একজন ক্রীতদাস কিনে দেবেন। রাবিয়া বললেন, সত্য কথা এই যে, যিনি সমস্ত পৃথিবীর মালিক, তার কাছেই পার্থিব কিছু চাইতে আমার লজ্জা হয়। অতএব যারা পৃথিবীর মালিক নয় তাদের কাছে কী করে আমি চাইতে পারি?

ইবাদাত করার ক্ষেত্রে হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) ছিলেন অতুলনীয়। তিনি যখনই সময় পেতেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি দিনে রোযা রাখতেন আর রাতে নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন যে, হে প্রভু! আমাকে আমার নিজ কাজে (ইবাদাতে) ব্যস্ত রাখুন যাতে আমাকে কেউ আপনার যিকির হতে বিমুখ করতে না পারে।

আধ্যাত্মিকতা

শুধু পুরুষরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে এমন নয়। অনেক নারীও আল্লাহর অলি হয়েছেন। আল্লাহ তাদের অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন। হযরত রাবেয়া বসরি (রহ.)-এরও অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল। একবার হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) খাবার রান্না করতে গেছেন। দেখেন পেঁয়াজ নেই। ভাবছেন, পেঁয়াজ কোথা থেকে আনব, কীভাবে আনব, কোনো দাস-দাসী নেই। সেবক সেবিকা নেই। মনে মনে এ কথাই ভাবছিলেন। এমন সময় লক্ষ করলেন, একটি চিল উড়ে যাচ্ছে। তাঁর পায়ে পেঁয়াজ। চিল পেঁয়াজগুলো ছুড়ে মারল, আর তা সোজা হযরত রাবিয়ার কাছে এসে পড়ল। তাঁকে বলা হলো, রাবিয়া! তুমি আমার হয়ে গেছ, আমি চিলকে তোমার সেবায় নিয়োজিত করলাম।

হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) একবার শস্য বুনছিলেন। পঙ্গপাল শস্যক্ষেতের ওপর এসে পড়েছিল। তখন রাবিয়া প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার প্রভু! এ হলো আমার জীবিকা। যদি আপনি চান তাহলে আমি তা আপনার শত্রুদের বা বন্ধুদের দিয়ে দেব। তখন পঙ্গপাল উড়ে পালিয়ে গেল।

আল্লাহর অলিদের বহু অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। তবে তারা এসব ক্ষমতা নিয়ে কখনো অহংকার করেননি। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো তা প্রকাশ করেননি; বরং তা আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে যেত।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.) সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি সর্বদা নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করতেন। আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা চাইতেন, সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা করতেন। তিনি বলতেন, মুখে মিথ্যা তাওবা করে কী লাভ যদি তা প্রমাণ করা না যায়? তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন ও মানব সেবায় রত ছিলেন।

রাবিয়া বসরি (রহ.)-এর ইন্তিকাল

অনেক শ্রম, কষ্টসাধ্য ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনযাপন করার পর আল্লাহর প্রিয় এই নারী ১৮৫ হিজরি মোতাবেক ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বসরায় দাফন করা হয়।

বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ ইবনে তুসি নামক এক লোক তাঁর কবরে যান। গিয়ে বলেন যে, হে রাবিয়া, আপনি গর্ব করতেন যে, উভয় জগতের বিনিময়েও আপনি আপনার মাথা নত করবেন না। আপনি কি সেই উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন? জবাবে একটি আওয়াজ এলো, আমি যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়েছি। আমরা তাঁর জীবনের আলোকে আমাদের জীবন গড়ব। ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাব।

প্যানেল/দলে আলোচনা

'হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.)-এর জীবনাদর্শের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ'

(উল্লিখিত দু'জন মনীষীর জীবনাদর্শের আধ্যাত্মিকতা, আত্মত্যাগ, শ্রমের মর্যাদা, সহনশীলতা প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি প্যানেল বা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত রাবিয়া বসরি (রহ.)-এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে কাজগুলো বাস্তব চর্চা/অনুশীলন করব'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি পূরণ করবে)।

মহামানবের নাম	গুণাবলি	যেভাবে চর্চা/অনুশীলন করব
ইমাম হাসান (রা.)	পরোপকারী	বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করব।

সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে মুসলিম মনীষীগণের অবদান

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানগণ যুগে যুগে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সেবায় মুসলমানগণ একসময়ে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণের অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

একক/জোড়ায় কাজ
'সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণের ক্ষেত্র'
শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে তোমার পছন্দের ক্ষেত্রগুলোর উল্লেখ করো।

চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাঁদের অবদানের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে সিনা, আবু বকর আল রাযি, ইবনে রুশদ ও হাসান ইবনে হাইসাম প্রমুখ। চলো আমরা তাঁদের পরিচয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তাদের অবদান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

ইবনে সিনা

ইবনে সিনার পুরো নাম আবু আলি আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি উজবেকিস্তানের বুখারার নিকটবর্তী আফসানা নামক গ্রামে ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল আবদুল্লাহ। পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরেই আবদুল্লাহ তাকে বোখারায় নিয়ে আসেন। সে সময় বোখারা ছিল মুসলিম জাহানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র। ১০ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। তিনি দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

১৬ বছর বয়স থেকে ইবনে সিনার ডাক্তারির নেশা জাগে, পড়তে পড়তে আবিষ্কার করতে থাকেন চিকিৎসার নতুন নতুন উপায়। ১৮ বছর বয়সেই পুরোদমে ডাক্তার হয়ে গেলেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন ইবনে সিনা। ফলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূরদূরান্তে। ৯৯৭ সালে আমির নূহ ব্যক্তিগত ডাক্তার পদে ইবনে সিনাকে নিয়োগ দেন। কারণ, তিনি নূহের কঠিন রোগের চিকিৎসা করেছিলেন এবং তাতে তিনি সেরে উঠেছিলেন।

ইবনে সিনা রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে 'আল কানুন ফিত তিব্ব' একটি অমর গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক বিপ্লব এনে দেয়। এত বিশাল গ্রন্থ সে যুগে আর কেউ রচনা করতে পারেনি। এটি ল্যাটিন, ইংরেজি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলোতে 'আল কানুন' গ্রন্থটি বহুকাল যাবত পাঠ্য ছিল। আল কানুন ৫টি বিশাল খণ্ডে বিভক্ত। বইগুলো সব লেখা শেষ হয় ১০২৫ সালে। গ্রন্থটিতে শতাধিক জটিল রোগের কারণ, লক্ষণ ও পথ্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। আধুনিক বিশ্বেও তাঁর গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে 'আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক' বলা হয়।

ইবনে সিনা ৫৮ বছর বয়সে ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ইরানের হামাদানে সমাহিত করা হয়।

ইবনে রুশদ

ইবনে রুশদের পুরো নাম আবু ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ। তিনি স্পেনের কর্ডোভায় ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যুবক ইবনে রুশদ প্রাথমিক পর্যায়ে লেখাপড়া করেন কর্ডোভাতে। তিনি জ্ঞান আহরণে ছিলেন পুরোপুরি আত্মনিবেদিত। তিনি ব্যাপকভাবে দর্শন ও ভেষজ বিষয়ে লেখাপড়া করেন। দুই প্রখ্যাত শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। তারা হচ্ছেন, আবু জাফর হারুন এবং ইবনে বাজা। মধ্যযুগে মুসলিমের মধ্যে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি তাঁদের একজন।

ইবনে রুশদ ছিলেন আধুনিক সার্জারির জনক। সেই সঙ্গে ছিলেন একজন বড় মাপের আধ্যাত্মিক সাধক। কাজে-কর্মে ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'আমি ক্ষতস্থান বেঁধে দেবো, ক্ষত সারাবেন আল্লাহ।' এই বিশ্বাসই তাঁকে অনেক ওপরে উঠার সুযোগ করে দেয়। হয়ে ওঠেন আল্লাহর প্রিয় পাত্র।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম হলো 'কিতাব আল কুল্লিয়াত'। চিকিৎসাশাস্ত্রে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। এতে রয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনটি মৌলিক বিষয়-রোগ বিশ্লেষণ (ডায়াগনোসিস), নিরাময় (কিউর) এবং প্রতিরোধ (প্রিভেনশন)। বইটিতে ইবনে সিনার 'আল-কানুন' সম্পর্কে সর্বশেষে উল্লেখ রয়েছে। এতে ইবনে রুশদের আসল পর্যবেক্ষণের বিষয় বিধৃত আছে। ইবনে রুশদ এই বইটি লেখেন ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দের আগে। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সমাদৃত হয়েছে।

ইবনে রুশদ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আল জামি'। এ গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। 'কিতাব ফি হারাকাত আল ফালাক' হচ্ছে ইবনে রুশদের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি বই। এই বইয়ে ভূমণ্ডলের গতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ইবনে রুশদ ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযির নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবু বকর, পিতার নাম যাকারিয়া। তাঁর পুরো নাম আবু বকর মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাযি। তিনি আল রাযি নামে পরিচিত। ইউরোপে অবশ্য তিনি আল রাজেস নামে পরিচিত। তিনি ৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল রাযির অবদান অবিস্মরণীয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই তাঁর কথা বলতে হয়। তবে তিনি শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না, ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, রসায়নবিদ ও দার্শনিক। দীর্ঘদিন তিনি জুন্দেরশাহপুর ও বাগদাদে সরকারি চিকিৎসালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তৎকালে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে অনেক রোগী তাঁর নিকট আসতেন।

শল্যচিকিৎসায় আল রাযি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাধিক হলো চিকিৎসাবিষয়ক। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের ওপর ‘আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ’ নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো ‘আল মানসুরি’। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। আল রাযির ২৩টি ভলিউমে রচিত ‘আল কিতাব আল হাওয়ি’ গাইনোকোলজি, অবেস্ট্রিকস এবং অপথ্যালমিক সার্জারির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। নয়টি ভলিউমে রচিত ‘দ্য ভার্চ্যুয়াস লাইফ’ বইটিতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর কাজ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টিশীল ধারণা দেন। এই বইটিতে আল রাযি তার বিভিন্ন বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান, নানা রকম রোগ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাঁর রাখা সমস্ত নোটকে একত্রিত করেছেন। এই বইটির জন্য অনেক পণ্ডিত তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বিবেচনা করেন।

তিনিই প্রথম চিকিৎসক, যিনি হাম ও গুটিবসন্তকে আলাদা রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এর আগে দুটি রোগকে একই ভাবা হতো। হাম ও গুটিবসন্ত সম্পর্কিত তাঁর পর্যবেক্ষণ স্থান পেয়েছে তাঁর ‘আজ্ জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ’ গ্রন্থে। ‘আল মানসুরি’ গ্রন্থে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মেজাজ, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধনদ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি পেডিয়াট্রিকস, অপথালমোলজি, নিউরো সার্জারি, সংক্রামক রোগসহ চিকিৎসাবিদ্যার অনেক শাখার গোড়াপত্তন করেন। তিনি ৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মস্থান ইরানে ইন্তিকাল করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গৌরবময় অবদানের জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হাসান ইবনে হাইসাম

হাসান ইবনে হাইসাম ইরাকের বসরা নগরীতে ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, সবই তিনি বাগদাদে লাভ করেন। তিনি ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান। সে সময়ে অধিক ব্যয়বহুল হওয়ায় কেবল সমাজের ধনী শ্রেণিই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। হাসান ইবনে আল হাইসামের শিক্ষা জীবন শুরু হয় বসরার একটি মক্তব থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। হাসান ইবনে হাইসাম একজন চক্ষুবিজ্ঞানী ছিলেন। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চক্ষুবিজ্ঞানবিষয়ক মৌলিক

গ্রন্থ 'কিতাবুল মানাযির' তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞানের এটি একমাত্র গ্রন্থ ছিল।

গবেষক রোযার বেকন, নিউলার্ডো, কেপলার প্রমুখ এ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেই তাঁদের গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টিশক্তির প্রতিসরণ ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খন্ডন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বাহ্যপদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। চোখ থেকে বের হওয়া আলো বাহ্যপদার্থকে দৃষ্টিগোচর করায় না। তিনিই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন।

আধুনিককালের বিজ্ঞানীরা গতি বিজ্ঞানকে তাদের আবিষ্কার বলে দাবি করলেও ইবনে হাইসাম এ বিষয়ে বহু পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। বায়ুমন্ডলের ওজন, চাপ ও তাপের কারণে জড়পদার্থের ওজনেও তারতম্য ঘটে। মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনকে (১৬৪২-১৭১৭ খ্রি.) মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত শক্তির আবিষ্কারক মনে করা হলেও ইবনে হাইসাম এ বিষয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। হাসান ইবনে হাইসাম ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রো শহরে ইন্তিকাল করেন।

রসায়নশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ন্যায় রসায়নশাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। আল-কেমি তথা রসায়ন শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান, আল কিন্দি, জুননুন মিসরি, ইবনে আবদুল মালিক আল-কাসি বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছে। চলো, আমরা তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

জাবির ইবনে হাইয়ান

জাবির ইবনে হাইয়ানের পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান। তিনি আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান নামেও পরিচিত। তিনি দক্ষিণ আরবের তুস নগরে আযদ বংশে ৭২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। গণিতশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ শেষে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন বিখ্যাত পন্ডিত ইমাম জাফর সাদিকের অনুপ্রেরণায় তিনি রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন। খুব অল্প সময়ে তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য ও বিভিন্ন পদার্থ আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হন। তিনি কুফায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই গবেষণারত ছিলেন।

রসায়নকে তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, ইউক্লিড ও আল মাজেস্টের ভাষ্য, দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম হচ্ছে : জীবাকুশ শরকি, কিতাবুল আরকানিল আরবা, কিতাবুল আহজার, কিতাবুল কালী, কিতাবুর রাহা, কিতাবুল ফিদ্দা, কিতাবুল মিহান, কিতাবুল রিয়াদ, কিতাবুল নুহাস,

কিতাবুল ইহরাক ইত্যাদি। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যথা পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তাঁরই আবিষ্কার। তিনি তাঁর গ্রন্থে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাঁকে এ শাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়।

জাবির ইবনে হাইয়ান বস্তুজগৎকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে স্পিরিট, দ্বিতীয় ভাগে ধাতু এবং তৃতীয় ভাগে যৌগিক পদার্থ। তাঁর এ আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করেই বিজ্ঞানীরা বস্তুজগৎকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। যথা: বাষ্পীয়, পদার্থ ও পদার্থ বহির্ভূত। বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে তার অবাধ বিচরণ ছিল না। তিনি সর্বদা হাতে-কলমে কাজ করতেন। প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল লিখে রাখতেন।

জাবির ইবনে হাইয়ান প্রথম কার্পূর, আর্সেনিক ও অ্যামোনিয়াম তাপ দিলে বাষ্প হওয়ার তথ্য তুলে ধরেন। মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ সোনা, রুপা, তামা ও দস্তা চূর্ণ করা যায় বলে তথ্য প্রদান করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান সর্বপ্রথম নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেন। এই দুই অ্যাসিডের মিশ্রণে তৈরি স্বর্ণ গলানোর পদার্থ 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' নামটি তাঁর দেওয়া। জাবির ইবনে হাইয়ান স্বর্ণ ও পরশ পাথর তৈরি করতে পারতেন। জাবির ইবনে হাইয়ান ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আল কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইবনে ইছহাক আল কিন্দি ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদ যান। দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে আল-কিন্দি নিজস্ব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জ্ঞানই তাকে ইসলামি গণিত থেকে ঔষধবিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ ও ভাষ্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। গণিত ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে ডাক্তারদের জন্য একটি স্কেল নির্ধারণ করেছিলেন। এই স্কেল দিয়ে ডাক্তাররা তাঁদের প্রস্তাবিত ঔষধের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে পারতেন। তাঁর পিতা ইছহাক খলিফা মামুনের শাসনামলে কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি অ্যারিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব (Theology of Aristotle) আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফা মামুনের সময় জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অনধিক ৩৬৫টি গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মতে গণিত ছাড়া দর্শনশাস্ত্র অসম্ভব। দর্শন ছাড়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাতৃভাষা আরবি ছাড়াও পাহলবি, সংস্কৃত, গ্রিক ও সিরীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আল কিন্দি ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

জুন্নুন মিসরি

জুন্নুন মিসরির নাম ছাওবান, পিতার নাম ইবরাহিম। তিনি জুননুন মিসরি নামে পরিচিত। তিনি মিসরের 'আখমিম' নামক স্থানে ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আরব মুসলিম

বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের ওপর যাঁরা প্রথম দিকে গবেষণা করেন তাঁদের অন্যতম। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর লেখায় সোনা, রুপাসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মিসরীয় সাংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝতেন। তিনি মিসরের আল-জিজাহ নামক স্থানে ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ইবনে আবদুল মালিক আল কাসি

ইবনে আবদুল মালিক আল-কাসির নাম আবুল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক আল-খারেজমি আল-কাসি। তিনি একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদেই অবস্থান করতেন। তাঁর লেখা 'আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ' (Essence of the Art and Aid of Worker) গ্রন্থটি রসায়নশাস্ত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন। তিনি এ গ্রন্থে রসায়নের প্রতিটি প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পন্থা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সকল বস্তু 'সাদা' এবং যে সকল বস্তু 'লাল' এগুলোর ব্যবহার ও পার্থক্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

রসায়নশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অনেক। আমাদের অনেকে হয়তো জানেই না মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া পৃথিবীর বড় বড় কাজকর্মের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (সৃষ্টি এবং মানবতার কল্যাণ)				
'সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে আমার পরিকল্পনা'				
ইসলামের মহামানবদের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণে কী কী কাজ করবে তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনাটি যেন বাস্তবসমত হয় (তোমার সুযোগ ও সামর্থ্যের মধ্যে) এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবেন।				
ক্র.মি	কার্যক্রম	গৃহিত পদক্ষেপ	সময়	অর্জিত হয়েছে/হয়নি
০১				
০২				
০৩				
অভিভাবকের মতামত/স্বাক্ষর:				

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে সহমর্মিতা

দলগত কাজ
‘আমাদের চারপাশের বিদ্যমান সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ’ (প্রিয় শিক্ষার্থী! তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে চারপাশে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। মনে রাখবে, এ অধ্যায়ের শেষে তোমাদের চিহ্নিত সমস্যাগুলো হতে তোমরা একটি সমস্যা নির্বাচন করে সেটি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।)

আমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টি। হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষই সমান। তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থা অনুসারে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি-পেশার মানুষ থাকে। সমাজে কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। এজন্য সমাজে প্রত্যেকেরই পরস্পরের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সকল ধর্মের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এসব দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহের অন্যতম।

মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে কিংবা কর্মক্ষেত্রে নানারকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কখনো সে আকস্মিক বিপদে পতিত হয় আবার কখনো সে অতিরিক্ত মানসিক চাপ অনুভব করে। এসব কারণে বিষণ্ণতা, মানসিক বিপর্যস্ততা, হতাশা ইত্যাদি তাকে পেয়ে বসে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে মানসিকভাবে একাত্ম হওয়ার নাম সহমর্মিতা।

সহমর্মিতা অর্থ সমব্যথী হওয়া, মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, সাহায্য করার ইচ্ছা করা, অপরের বেদনা নিজের ভেতর অনুধাবন করা ইত্যাদি। মানুষের দুঃখ-কষ্টে, বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে পাশে থাকা কিংবা বিপন্ন মানুষের বেদনা, মনোকষ্ট উপলব্ধি করে তাদের সঙ্গে একাত্ম ও সমব্যথী হওয়াই সহমর্মিতা। অন্য কথায়- মানুষের সকল যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন ও বিষণ্ণতাকে নিজের অনুভূতিতে স্থান দিয়ে সে অনুযায়ী আচরণ করাকে সহমর্মিতা বলে।

ইসলামে সহমর্মিতার স্বরূপ

ইসলাম মানবিক মূল্যবোধ চর্চা করতে শেখায়। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন তারই অংশ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সমাজের সবার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। মহানবি (সা.) এবং সাহাবিদের জীবনে সহমর্মিতার অনেক বাস্তব শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়।

সাহাবিরা সব সময় নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করতেন না। নিজেরা ক্ষুধার্ত হলেও অন্যের মুখে খাবার তুলে দিতেন। নিজেদের ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, কৃষিজমি, গবাদিপশু–সবকিছুই তারা অপরের কল্যাণে অবলীলায় দান করতেন।

মহানবি (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সাহাবিও হিজরত করেন। হিজরত করে আসা এই মুহাজির সাহাবিদেরকে মদিনার আনসার সাহাবিরা সাদরে বরণ করে নেন। নিজেদের ধন সম্পদ, ঘর-বাড়ি মুহাজিরদের দিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ সহমর্মিতাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তাঁরা (আনসার) তাঁদেরকে (মুহাজির) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদের অন্তর কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯)

হাদিসে এক মুসলিমকে অপর মুসলিমের ভাই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই এক ভাই কখনোই অপর ভাইকে অপমান করবে না, তার জান-মালের ক্ষতি হতে দেবে না, তাকে হেয় করে দেখবে না; বরং সেই ভাই যখনই কোনো বিপদে পড়ে, তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করতে হবে, প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যথিত হলে সান্ত্বনা দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবারস্বরূপ। সাধারণত কারো পরিবারের প্রতি কেউ সদাচরণ করলে পরিবারের কর্তাও তাঁকে ভালোবাসেন। তাই সৃষ্টিজগতের কারো প্রতি কেউ ভালো আচরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভালোবাসেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন। তাঁর পবিত্র সাহচর্যে রোগী স্বস্তি বোধ করত। এমনকি অমুসলিম কেউ অসুস্থ হলেও তিনি তাকে দেখতে যেতেন। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। বিভিন্নভাবে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। একবার এক ইহুদি বালক অসুস্থ হয়ে পড়ল। মহানবি (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার শিয়রে বসে তাকে স্নেহভরে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বালকটি তখন ইসলাম গ্রহণ করল। মহানবি (সা.) বললেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'

মানুষের দুঃখে মর্মবেদনা অনুভব করা, সহমর্মী হওয়া ইসলামের শিক্ষা। মুতার যুদ্ধে বিশিষ্ট সাহাবি হযরত জাফর তাইয়ার (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন বহু দূরে মদিনায় অবস্থান করছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তখনই এই খবর জানিয়ে দিলেন। তিনি এরপর জাফর (রা.)-এর বাড়িতে গেলেন। তার সন্তানদের জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন, তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি সবাইকে বলে দিলেন, জাফর (রা.)-এর পরিবারের প্রতি যেন বিশেষ নজর রাখা হয়। সবাই তখন জাফর (রা.)-এর বাড়িতে খাবার রান্না করে পাঠিয়েছিলেন। কেউ মারা গেলে তার পরিবারের সবাই শোকে বিপর্যস্ত থাকে। স্বাভাবিকভাবে রান্না করে খাওয়ার মতো মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এ জন্য মহানবি (সা.) এর নির্দেশনা হলো, মৃতের বাড়িতে রান্না করে খাবার পাঠানো। এটা ইসলামের সহমর্মিতাবোধের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতিও মহানবি (সা.) সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। কারণ, তিনি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকামী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থ: 'আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

মহানবি (সা.)-এর জীবনীতে আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি সহমর্মিতার অসংখ্য উদাহরণ পাই। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর উম্মতকে সকল সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। একবার হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের মা আসমার কাছে বেড়াতে এলেন। তিনি সঙ্গে করে মেয়ের জন্য কিছু উপহার এনেছিলেন। কিন্তু তিনি অমুসলিম ছিলেন বলে আসমা (রা.) সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার মা তো অমুসলিম। মায়ের সঙ্গে আমি কেমন আচরণ করব?' রাসুলুল্লাহ (সা.)-আসমা (রা)-কে নির্দেশনা দিলেন, তিনি যেন তাঁর মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন।

মক্কার কুরাইশ কাফিররা সব সময় মহানবি (সা.)-কে হত্যা করতে চেয়েছে, ইসলামকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেন। অভিভূত হয়ে তখনই অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধের সময় যেসব কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি সহমর্মী হতে এবং সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের পরে বনু হানিফা গোত্রের প্রধান হযরত সুমামা ইবন উসাল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন মক্কায় গেলেন, মক্কার কাফিররা বলল, 'সুমামা, তুমি তো ধর্মত্যাগী হয়েছো।' সুমামা তখন বললেন, 'আমি মুসলমান হয়েছি। যতক্ষণ না রাসুলুল্লাহ (সা.) আদেশ দেন, তোমাদের এক দানা গমও আমি পাঠাব না।' এরপর সুমামা নিজ এলাকায় ফিরে এসে মক্কায় গম রপ্তানি বন্ধ করে দেন। কুরাইশরা দারুন খাদ্যাভাবে পড়ে গেল। তখন তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে খাবারের জন্য অনুরোধ করল। রাসুলুল্লাহ

(সা.) অনতিবিলম্বে সুমামাকে গম সরবরাহ করার আদেশ করলেন। সুমামা পুনরায় গম সরবরাহ শুরু করেন। মক্কাবাসীর খাদ্যের অভাব দূর হলো। অথচ মক্কার কাফির কুরাইশরা তখনো রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতিপূর্বে তারাই মহানবি (সা.)-কে তিন বছর খাদ্য-পানীয় না দিয়ে শিয়াবে আবু তালিব উপত্যকায় আটকে রেখেছিল। মহানবি (সা.) চাইলে তাঁর শত্রুদের খাদ্যের কষ্ট দিয়ে দুর্বল করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু এই ভয়াবহ নির্দয় শত্রুর প্রতিও তিনি অসাধারণ সহমর্মিতা দেখালেন।

পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদিনও মহানবি (সা.)-এর এই আদর্শ অনুসরণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) যখন কোনো অমুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিকে পেতেন, তাকেও বায়তুলমাল থেকে মুসলিম ব্যক্তির মতো সহযোগিতা করতেন। পবিত্র কুরআনে এমন সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।' (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)

একক কাজ
'আমি দৈনন্দিন কার্যক্রমে যেভাবে সহমর্মিতা চর্চা করবো' (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি তোমার বাস্তব জীবনে সহমর্মিতা চর্চার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করো। এ কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনে তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, সহপাঠী বা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো)।
....

সহমর্মিতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানবজীবনে সহমর্মিতার চর্চা থাকা খুবই জরুরি। সহমর্মিতায় মানুষের মানবিকতা প্রকাশ পায়। পারস্পরিক সহমর্মিতা না থাকলে মানুষ সমাজে থেকেও মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ থাকে। তখন কেউ বিপদে-আপদে কারো পাশে দাঁড়ায় না, পারিবারিক বন্ধন ভেঙে পড়ে, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা বলার মতো কাউকে পাওয়া যায় না। এর ফলে মানসিক সমস্যাও বেড়ে যায়। সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বড় কারণ সহমর্মিতার অভাব।

সহমর্মিতা থাকলে সামাজিক সংহতি থাকে। সামাজিক সংহতি থাকলে সমাজের সকল মানুষ মিলেমিশে আনন্দে জীবনযাপন করতে পারে। হাদিসে সমগ্র মুসলিম জাতিকে একটি মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানবদেহের কোনো অঙ্গ পীড়িত হলে ব্যক্তির পুরো শরীর জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাকে অনিদ্রা পেয়ে বসে।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কোনো মুসলিম সমস্যায় পড়লে অপর মুসলিম মনোবেদনা অনুভব করে।

সহমর্মী ব্যক্তিকে আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাত সর্বত্র সাহায্য করেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টের একটি দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে, মহান আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দার সহায়তায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তায় থাকে।' (মুসলিম)

ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের সঙ্গে সহমর্মিতার সরাসরি সংযোগ রয়েছে। যেমন হাদিসে রমযান মাসকে সহমর্মিতার মাস বলা হয়েছে। দান-সদকা করা, যাকাত দেওয়া, খাদ্য প্রদান করা, ইয়াতিম ও বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা–প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম আখিরাতে মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে।

আমরা বাস্তবজীবনে ইসলামের সহমর্মিতার শিক্ষা প্রয়োগ করব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কেউ কষ্টে থাকলে সহমর্মী হয়ে তার পাশে দাঁড়াব। তাকে সান্ত্বনা দেবো। তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করব। তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করব। ইসলামের এই শিক্ষা মেনে চললে আমরা নিজেরাও যখন কোনো বিপদে পড়ব, আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে থাকবে। সবাই আমাদের প্রতি সহমর্মী হবে। তখন সামাজিকভাবে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

অনুভূতি কর্নার
শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক এ অধ্যায়ের শুরুতে তোমাদের নির্বাচিত সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ সমাধানের জন্য সবাই মিলে একটি অনুভূতি কর্নার তৈরি করো। যথাযথ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে 'অনুভূতি কর্নার' এ প্রাপ্ত সহযোগিতা প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণি শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী বিতরণের ব্যবস্থা করো।

রোগ প্রতিরোধে সুষম খাবার

চাহিদা অনুযায়ী শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য উপাদান যতটুকু দরকার আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই উপাদানগুলো ততটুকু থাকলেই তা সুষম খাদ্য।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
নবম শ্রেণি
ইসলাম শিক্ষা

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই
– আল কুরআন

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য